বাংলার বিচার ব্যবস্থা (১৩৩৮-১৫৩৮)

Judicial System of Bengal (1338-1538)

এম. ফিল গবেষক

মুহাম্মদ আবদুল আজিজ

রেজিস্ট্রেশন নং- ৪২, (সেশনঃ ২০১৮-২০১৯)
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ মোশাররফ হোসাইন ভূঁইয়া

অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।

অঙ্গীকারপত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, **“বাংলার বিচার ব্যবস্থা (১৩৩৮-১৫৩৮)” Judicial System of Bengal (1338-1538)** শিরোনামের গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব রচনা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য প্রণীত। আমার জানামতে পূর্বে এই শিরোনামে কেউ গবেষণা করেন নি। অভিসন্দর্ভটি অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্য জমা দেয়া হয় নি। এমনকি অভিসর্ন্দভটি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশ করা হয় নি।

২৮।০৫।২৫

মুহাম্মদ আবদুল আজিজ

এম.ফিল গবেষক

রেজিষ্ট্রেশন নং- ৪২

(সেশনঃ ২০১৮-২০১৯)

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রত্যয়নপত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, **মুহাম্মদ আবদুল আজিজ** রেজিস্ট্রেশন নং- ৪২, (সেশনঃ ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল গবেষক হিসেবে আমার তত্ত্বাবধানে **"বাংলার বিচার ব্যবস্থা (১৩৩৮-১৫৩৮)"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করেছেন। গবেষণাটি মৌলিক তথ্যের ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে রচিত। আমি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার সুপারিশ করছি।

২৮.৫.২৫

ড. মোঃ মোশাররফ হোসাইন ভূঁইয়া

অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শুরুতে মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি যাঁর দয়া ও অনুগ্রহে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য একজন গবেষককে তাঁর অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ, অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হতে হয়। অনুরূপভাবে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভ **"বাংলার বিচার ব্যবস্থা (১৩৩৮-১৫৩৮)"** রচনা করতে গিয়ে আমি অনেক জ্ঞানী-গুণী, অভিজ্ঞ গবেষক ও বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তির সহযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করেছি। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারের সহায়তা লাভ করেছি। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করছি আমার এ দায়বদ্ধতা।

আমি এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ও খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ মোশাররফ হোসাইন ভূঁইয়া স্যারের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তিনি আমাকে গবেষণার মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে শিখিয়েছেন। গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান, অধ্যয়ন পরিকল্পনা, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, লিখন পদ্ধতি ও সার্বিক উপদেশ দিয়েছেন। তিনি আমাকে স্নেহ ও যত্ন সহকারে গবেষণা কর্মটি শেষ করবার কাজে অশেষ পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে সহযোগিতা ও পথনির্দেশনা দিয়েছেন। তা বলার ভাষা আমার নেই। অনেক বিরক্ত করে ও কাজে অবহেলা করে স্যারকে কষ্ট দিয়ে নিজেকে অপরাধী করেছি। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই গবেষণা কর্মের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁরই।

আমার জীবনের সব অর্জনের কেন্দ্রবিন্দু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ। ইতিপূর্বে বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পাই নি। আজ আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকগণের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা জানাই। একইসাথে আমার শিক্ষাজীবনের অন্য সকল পর্যায়ের প্রয়াত ও জীবিত শিক্ষকগণের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সকলের স্নেহ, ভালবাসা, শাসন, বারণ, উপদেশ, অনুপ্রেরণা ও দোয়ার ঋণ আমার শোধ করার মতো নয়। তাঁরা ছাত্র হিসেবে

আমাকে গ্রহণ ও পাঠদান করে চিরকৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেছেন। এতেই আমি আনন্দিত ও ধন্য।

যাঁদের সার্বক্ষণিক উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেয়েছি তাঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক মোঃ মাহফুজুল ইসলাম ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির স্যারদ্বয় গবেষণার প্রাথমিক প্রস্তুতি মূলক কোর্স পাঠ করিয়ে আমাকে উপযুক্ত করে ঋণী করেছেন। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আহসান উল্লাহ (আহসান সাইয়েদ); স্যার যিনি আমাকে উচ্চতর গবেষণা কর্মে সম্পৃক্ত হওয়ার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া'র অধ্যাপক ড. মুহিব্বুল ইসলাম স্যার; তাঁর কাছে যখনই কোন সাহায্য চেয়েছি, তিনি তখনই আমায় সাহায্য করেছেন। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারি অধ্যাপক সাঈদ আহসান খালিদ তাঁর কাছেও আমি কয়েকটি বিষয়ে সাহায্য পেয়েছি তাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

এছাড়াও আইন গবেষক ড. মঈন উদ্দিন আহমদ অ্যাডভোকেট যিনি গবেষণা কাজে আমাকে নানাভাবে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা রইল। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ও আমার সহোদর বড় ভাই অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আবদুল মান্নান যাঁর ছায়ায় আমার শিক্ষাজীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছি আমি তাঁর প্রতি অশেষ সম্মান ও ভালবাসা জ্ঞাপন করছি। অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন যিনি আমার গবেষণা কর্মের বিষয়ে খুবই উৎসাহী ও যত্নশীল হয়ে সহযোগিতা করেছেন-তাঁর প্রতিও আমার অসীম কৃতজ্ঞতা রইল। আরো যাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই তারা হলেন আমার সহকর্মী অ্যাডভোকেট উম্মে ফেরদৌস, অ্যাডভোকেট নাছির উদ্দিন ও অ্যাডভোকেট আবু বক্কর উল্লেখযোগ্য।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মৌলানা ফররুখ আহমদ আজাদ যিনি ইসলামী সুবক্তা ছিলেন। অগাধ পাণ্ডিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি বিগত ২৮ই মে ২০২৪ ইং তারিখ মৃত্যুবরণ করেন। এই অভিসন্দর্ভ পরিসমাপ্তির শুভক্ষণে তিনি বেঁচে থাকলে আজ অনেক আনন্দিত হতেন। আমি মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করি যেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন, আমীন।

আমার গর্ভধারিণী মাতা গোলতাজ বেগম যিনি অসম্ভব ধৈর্য্য, মমতা ও দায়িত্ব নিয়ে আমাদের ভালবাসার চাঁদরে আবৃত করে রেখেছেন। তিনি আমার প্রতিটি কাজে সাহস এবং অসম্ভবকে জয় করার প্রত্যয় যুগিয়েছেন। আমাদের সুশিক্ষিত করার জন্য এখনো তিনি উদ্বিগ্ন থাকেন। মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান করুন।

দু'জন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে স্মরণ করছি যাঁরা আমাকে দোয়া ও ভালবাসা দিয়ে সন্তানের মতো আগলে রেখেছেন, তাঁরা হলেন আমার শ্বশুর হাজী আবদুল জলিল খান এবং শ্বাশুড়ি হোসনে আরা বেগম। তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার সহধর্মীনি অ্যাডভোকেট ফারহানা আক্তার; একজন সৎ, কর্মঠ, দায়িত্বশীল ও ধার্মিক ব্যক্তি হন। তিনি সংসার ও সন্তান দুটোই সুচারুরূপে পরিচালনা করে আমাকে মানসিক চাপ মুক্ত রেখেছেন। অভিসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপি পাঠ করার কষ্টসাধ্য কাজ করে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সন্তান আহনাফ সা'আদ শেহ্‌রান ও ফারনাজ আরোয়া'দের জন্য বিশেষ দোয়া ও ভালবাসা রইল।

আরেকজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলে কার্পণ্যতা হবে। সে আমার সহোদর ছোট ভাই শিক্ষানবিশ আইনজীবী মোহাম্মদ মনির উদ্দীন নজরুল। যার অক্লান্ত পরিশ্রমে অভিসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপি পাঠ ও কম্পিউটার টাইপিং কার্য সমাপ্ত করা সম্ভব হয়। তার প্রতি আমার অফুরন্ত কৃতজ্ঞতা, দোয়া ও ভালবাসা।

এছাড়া যেসব নবীন-প্রবীণ ইতিহাস গবেষকগণের মূল্যবান রচনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি তাঁদের সবার কাছেই আমি দায়বদ্ধ।

গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে আমাকে বেশ কিছু গ্রন্থাগার ও জাদুঘর ব্যবহার এবং পরিদর্শন করতে হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ পাঠাগার, এম আর তরফদার স্মৃতি জাদুঘর, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পাবলিক লাইব্রেরি, বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার- চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি

লাইব্রেরি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের কাছে সবসময় সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি। সে জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বিভাগের চেয়ারম্যান প্রখ্যাত গবেষক অধ্যাপক মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস স্যারের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকগণের প্রতিও আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

পরিশেষে বলা যায়, কোনো মানুষই ভুল-ক্রুটির উর্ধ্বে নয়। কথাটি আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বটে। আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টার পরেও গবেষণা কর্মটিতে বেশ কিছু ভুল-ক্রুটি ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যার দায়ভার একান্তই আমার।

২৮।০৫।২৫

(মুহাম্মদ আবদুল আজিজ)

মুখবন্ধ

দশম শতাব্দির শেষভাগে এবং একাদশ শতাব্দির শুরুতে তুর্কি বংশোদ্ভুত গজনীর সুলতান মাহমুদ উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভারত আক্রমণ করেন। ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মোট ১৭ বার ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেন। এসব অভিযানে তিনি অসংখ্য মন্দির ধ্বংস করেন ও মন্দিরের সম্পদ নিজের করায়ত্ত করেন। এভাবে প্রতিটি অভিযানেই তিনি প্রচুর ধন সম্পদ অর্জন করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এইযে, ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁর করতলগত হলেও তিনি বিজিত অঞ্চলে কোন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেননি। প্রকৃতপক্ষে, রাজ্য প্রতিষ্ঠা বা রাজ্য বিস্তারের চেয়ে ভারতের ধন-সম্পদ আহরণেই তিনি বেশি আগ্রহী ছিলেন। মুহাম্মদ ঘুরি ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দে গজনীর মসনদে আরোহণ করার পর ভারতে রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারত আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি পৃথ্বিরাজের কাছে পরাজিত হন। পরের বছর অর্থাৎ ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করেন এবং দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি মুলতান, পাঞ্জাব, চন্দ্রভার, গোয়ালিয়র, কনৌজ, কালিঞ্জর, আনহিলওয়ার প্রভৃতি করায়ত্ত করে অবশেষে দিল্লি দখল করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। এভাবে দ্বাদশ শতাব্দির শেষের দিকে ভারতের উত্তরাঞ্চলে একটি মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্যদিকে দিল্লীর সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের সেনাপতি বখতিয়ার খলজি ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে নদীয়ার শাসনকর্তা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে প্রথম বাংলাকে দিল্লীর প্রদেশ হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনের নানাবিধ দুর্বলতার সুযোগে সোনারগাঁও প্রদেশের শাসনকর্তা ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। প্রকৃতপক্ষে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭ খ্রিঃ) সমগ্র বাংলাকে একত্রিত করে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একারণে তাঁকে *শাহ-ই-বাঙ্গালা* নামে অবিহিত করা হয়। বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ দু'শো বছর (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিঃ) পর্যন্ত স্বাধীনভাবে বাংলাকে শাসন করেন।

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের বহুবিধ কৃতিত্ব রয়েছে। সুলতানগণ তাঁদের শাসনামলে প্রশাসনিক সাফল্য, সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণ, স্থাপত্য শিল্প, সাহিত্য, ধর্মীয় ও

সাংস্কৃতিক, সামাজিক, আর্থিক এবং বিচার বিভাগীয় বিভিন্ন সফলতা অর্জন করেছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দু'শো বছরের স্বাধীন সুলতানি আমলে বাংলার বিচার ব্যবস্থার উন্নতি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়। সমাজ সংস্কারক সুলতানগণ বিচার প্রশাসনে সংস্কার করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।

১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার স্বাধীন সুলতানদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে সেই সময়ের সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক, সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে হবে। যা অত্র অভিসন্দর্ভের শুরুতে আলোকপাত করা হয়েছে।

বাংলার সুলতানগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম ছিলেন। সুলতান আইন প্রনয়ন করতেন এবং শাসন ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী ছিলেন। সুলতান ইসলামের বিধি বহির্ভূত আইন প্রণয়ন করতেন না। শিলালিপিতে সুলতানকে ন্যায়বিচারক ও জ্ঞানী বলা হয়েছে। সুলতান নিজের বিরুদ্ধে কাজীর বিচার মেনে নেয়ার দৃষ্টান্তও স্বাধীন বাংলায় দেখা গেছে। বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে সুলতান সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এমনকি, সর্বোচ্চ আপীল আদালত ছিল সুলতানের আদালত। বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলের বিচার বিভাগ একটি দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক, জেলা বা সরকার, উপজেলা, পরগণা এবং গ্রাম এসব স্তরে গড়ে তোলা হয় আদালত। প্রতিটি স্তরে আদালতের ক্ষমতা ও এখতিয়ার সুনির্দিষ্ট ছিল। এই বিচার ব্যবস্থার বিশাল অধ্যায়টি আইনজ্ঞ ও গবেষকদের গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

ছাত্রাবস্থায় আমার পাঠ্যসূচির অন্যান্য পত্রগুলোর মধ্যে প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি একটা প্রগাঢ় ভালবাসা ও টান ছিল। পরে একজন আইনজীবী হিসেবে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালীন বিচার ব্যবস্থার ইতিহাস জানার প্রতি একটি বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি হলে বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিঃ) এর বিচার বিভাগ সম্পর্কে নতুন কোনো অজানা ঐতিহাসিক সুত্র যুক্ত করার অভিপ্রায়ে আমার যে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এটা তারই অংশ।

২৮/০৫/২৫

মুহাম্মদ আবদুল আজিজ
এম.ফিল গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচিপত্র

১। অঙ্গীকারপত্র **i**

২। প্রত্যয়নপত্র **ii**

৩। কৃতজ্ঞতা স্বীকার **iii- vi**

৪। মুখবন্ধ **vii- viii**

৫। সূচিপত্র **ix**

৬। সারসংক্ষেপ **x**

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা ০১-৯

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বাংলায় সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা। ১০-৩২

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বাংলার বিচার প্রশাসন ৩৩-৪৪

চতুর্থ অধ্যায় ঃ আদালতের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ৪৫-৬২

পঞ্চম অধ্যায় ঃ শাস্তির ধরণ ও প্রয়োগ ৬৩-৭১

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ বিচার ব্যবস্থার ফলাফল ও মূল্যায়ন ৭২-৯৭

সপ্তম অধ্যায় ঃ উপসংহার ৯৮-১০১

পরিশিষ্ট -১ বাংলার মানচিত্র ১০২

পরিশিষ্ট -২ বাংলার পতাকা ১০৩

পরিশিষ্ট -৩ বাংলার সুলতানদের বংশানুক্রমিক তালিকা ১০৪-১০৫

পরিশিষ্ট -৪ বাংলার সুলতানদের মুদ্রার ছবি ১০৬-১০৮

পরিশিষ্ট -৫ আদালতের প্রতিকী ছবি ১০৯

গ্রন্থপঞ্জি ১১০-১১৯

সারসংক্ষেপ (Abstract)ঃ

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগই মূখ্য ভূমিকা পালন করে। বিচার বিভাগের মাধ্যমে- রাষ্ট্রে অপরাধমূলক কাজে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তির বিধান, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা হয়। রাষ্ট্রে সাম্য ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে একটি পরিপূর্ণ বিচার ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ তাঁদের শাসনামলে রাজ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়। ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি নদীয়ার হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় সর্বপ্রথম মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ সময় বাংলা বিচ্ছিন্নভাবে দিল্লীর প্রদেশ হিসেবে গভর্ণর দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হয়েছে। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁয়ের তৎকালীন গভর্ণর ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলা দীর্ঘ দু'শো বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বাধীন সুলতানদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। এই দু'শো বছর স্বাধীন সুলতানগণ বাংলার জনগণের কল্যাণে নানামুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন। বিশেষ করে বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগকে সমৃদ্ধ করার বহুবিধ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সুলতানগণ রাষ্ট্রের রাজধানী থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত *কাজী* নিয়োগের মাধ্যমে বিচারিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন। সুলতান নিজেই রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের প্রধান হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। সূত্রোক্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভে বিশেষ করে বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসন আমলের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। দু'শো বছরের বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসনামলের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় অবস্থা, প্রশাসনিক বিভাগ, বিচার প্রশাসনের কাঠামো, বিচার ব্যবস্থার গঠন, বিচারিক আদালতের শ্রেণিবিন্যাস, *কাজী* বা বিচারক নিয়োগ পদ্ধতি, আদালতের এখতিয়ার, ক্ষমতা ও কার্যাবলি, দণ্ডিত ব্যক্তির শাস্তির ধরন ও প্রকার, শাস্তির প্রয়োগ পদ্ধতি, বাংলার বিচার ব্যবস্থার ফলাফল ও মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয়ে বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকাঃ

ভারত উপমহাদেশে বহির্বিশ্ব থেকে যেসব মুসলমান আগমন করেছিলেন, তাদেরকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। একদল ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে তাঁরা ইসলামের সু-মহান আদর্শ ও বাণী প্রচার করেন। অপরদল অলী, দরবেশ, সুফি ও ফকির তাঁরা শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের বানী মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেন। ভারত উপমহাদেশে যে মুসলিম বীর সর্বপ্রথম আগমন করেন তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিম। তিনি ৭১২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সিন্ধু প্রদেশে বিজয়ীর বেশে আগমন করে ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করেন। ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্য বিস্তার দু'পর্যায়ে হয়েছিল; যা সুলতানি ও মুঘল শাসন। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে পলাশীর বিপর্যয় পর্যন্ত সময়কালকে সাধারণভাবে বাংলার মুসলিম শাসন আমল ধরা হয়। ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি হিন্দু রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় সর্বপ্রথম মুসলিম রাজত্ব কায়েম করেন। দিল্লীর শাসকগণ তখন বাংলার জন্য গভর্নর নিয়োগ করে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা শুরু করেন। বাংলা ছিল দিল্লীর বহুদূরে। দিল্লী থেকে বাংলায় সরাসরি শাসন পরিচালনা করা সুলতানগণের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। দিল্লী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও অশান্তি সৃষ্টির ফলে দিল্লী থেকে সুদূরে বাংলার উপর সুলতানগণের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। তাছাড়া বাংলা প্রদেশের ভৌগলিক অবস্থান, দীর্ঘমেয়াদী বর্ষাঋতু, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাংলার জনগণের জীবনাচার, দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসকদের দুর্বলতা এবং বাংলার সম্পদের প্রাচুর্য ইত্যাদি কারণে বাংলায় নিয়োজিত গভর্নররা প্রায়ই বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন। এসব কারণে দিল্লীর সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলে পূর্ব বাংলার তথা সোনারগাঁয়ের তৎকালীণ গভর্নর ফখরা শাহ প্রথমে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ উপাধি ধারণ করে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং পূর্ব বাংলায় স্বতন্ত্র স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। একই সময়ে লক্ষ্ণৌতিতে কদর খানও (১৩৩৮-৪১ খ্রিঃ) স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কদর খানকে হটিয়ে তাঁরই *আরিজ-ই-মুমালিক* (সেনা প্রধান) আলী মোবারক (১৩৪১-৪২ খ্রিঃ) আলাউদ্দিন আলী শাহ উপাধি ধারণ করে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। স্বাধীন সুলতানী

আমলের প্রাথমিক যুগে সোনারগাঁও ছিল বাংলার রাজধানী। পরবর্তীতে সোনারগাঁও রাজধানীর মর্যাদা হারিয়ে ফেলে এবং রাজধানী পরিবর্তন হয়। স্বাধীন সুলতানি আমলে ফীরূজাবাদ (পাণ্ডুয়া), লখনৌতি এবং একডালায় রাজধানী (দার-উল-মুলূক) স্থাপিত ছিল।[১]

বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের রাজ্যসীমা ছিল বিস্তৃত। সুলতানগণ রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করতেন। বখতিয়ার খলজির অধিকৃত বাংলায় তুর্কি রাজ্যের সীমানা উত্তরে (ভারতের) পশ্চিমবঙ্গের দেবকোট হয়ে রংপুর পর্যন্ত, দক্ষিণে পদ্মা, পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; পশ্চিমে বখতিয়ার খলজির পূর্ব অধিকৃত বিহার ও তৎসংলগ্ন এলাকাও তাঁর অধীনে ছিল।[২] এভাবে ধীরে ধীরে রাজত্বের সীমা বাড়তে থাকে। ত্রয়োদশ শতকের শেষ দশকে ত্রিবেনী, সাতগাঁ; চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকে উত্তর-পূর্বে শ্রীহট্ট এবং ষোড়ষ শতকের চতুর্দশ দশকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।[৩] এভাবে পঞ্চদশ শতকের মধ্যেই দক্ষিণ বঙ্গের অপরাপর হিন্দু রাজ্য আফগানদের করতলগত হয়।[৪] অন্যদিকে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনামলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) কামতা-কামরূপ, আসাম ও উড়িষ্যার কিয়দংশ বাংলার অধীনে আসে।[৫] নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৪৩৭-১৪৫৯ খ্রিঃ) সময়ে দক্ষিণ বাংলা অর্থাৎ যশোর-খুলনা অঞ্চল চুড়ান্তভাবে বিজিত হয়ে বাংলার সালতানাতের সঙ্গে একিভূত হয়ে পড়ে। বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ পরবর্তীতে বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে সমগ্র বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

বখতিয়ার তাঁর নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যকে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য তিনটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করেন।

তথ্যসূত্রঃ

---

১. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস(সুলতানী আমল)*, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৮, পৃ.৪০৭

২. মোঃ শহিদুর রহমান, *মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, (১২০৫-১৭৫৭খ্রিঃ)*, ঢাকা, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৮১

৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

-শাসনতান্ত্রিক বিভাগগুলো শাসন করার জন্য সিনিয়র সেনাপতিদের নিয়োগ দেন। উল্লেখযোগ্য, তিনজন প্রশাসকের নাম আলি মর্দান খলজি, যিনি বরসৌল এর প্রশাসক, হুসাম উদ্দিন ইয়জ খলজি যিনি গঙ্গাতরীর প্রশাসক এবং শীরান খলজি যিনি মাসেদা সন্তোসের দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন। বখতিয়ারের শাসনতান্ত্রিক বিভাগগুলোকে *ইকতা* বলা হয়। *ইকতা*র শাসকদেরকে *মুকতা* বলা হতো। অনুরূপভাবে, বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসনামলের শুরুর দিকে বাংলাকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল। বাংলাকে মূলত তিনটি প্রদেশে ভাগ করা হয়েছে। প্রদেশ গুলো ছিল যথাক্রমে-(ক) সোনারগাঁও অঞ্চল (খ) সাতগাঁও অঞ্চল এবং (গ) লক্ষ্মৌতি অঞ্চল। সুলতান ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭ খ্রিঃ) প্রথমে বাংলাকে একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক অঞ্চলে এনে বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করেন। সমসাময়িক শিলালিপি, মুদ্রা ও দলিলপত্র থেকে জানা যায়, বাংলার প্রশাসনিক বিভাগগুলো নিম্নবর্ণিত নামে পাওয়া যায়। যথা- ইকলিম, আরসাহ, শিক, শহর, থানা/মহল, কসবা, খিত্তা, পরগণা ও গ্রাম উল্লেখযোগ্য। বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলে বাংলায় প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার কথাও উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাদেশিক ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্কও রয়েছে। সুলতান হোসেন শাহ (১৪৯০-১৫১৯ খ্রিঃ) এর শাসনামলে ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ দেবকোট শিলালিপিতে 'বাক্‌লা' নামে প্রদেশ এর প্রশাসকের নামোল্লেখ আছে।[৬] এম.আর তরফদার মুদ্রা, পদক ও খোদিত (Epigraphic) প্রমাণ উল্লেখ করে (ক) চট্টগ্রাম, (খ) ত্রিপুরা, (গ) ইকলিম মোয়াজ্জমাবাদ, (ঘ) সিলেট, (ঙ) ফতেহাবাদ, (চ) খলিফাতাবাদ, (ছ) লক্ষ্মৌতি বা সাজনামানকাবাদ, (জ) বারবাকাবাদ, (ঝ) সাতগাঁও, (ঞ) আরসহ, (ট) হাজীপুর, (ঠ) দক্ষিণ বিহার এর রাজনৈতিক কেন্দ্র মুঙ্গের, ড) নতুন অধিকৃত কামরূপ ও কামতাকে বাংলার বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানী হিসেবে উল্লেখ করেন।[৭] এভাবে স্বাধীন বাংলার প্রশাসনিক ও বিচারিক বিভাগগুলো গড়ে উঠেছিল।

তথ্যসূত্র

---

৬. সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *বাংলার শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস*, ঢাকা, আফসার ব্রাদার্স, ২০২২, পৃ. ১১৬

৭. মোঃ শহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮

তুর্কী শাসনামলে বাংলাদেশ ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর অধীন একটি প্রদেশ হিসেবে শাসিত হয়। সে হিসেবে বাংলায় দিল্লীর শাসন ও বিচার ব্যবস্থার অনুরূপ নিয়ম পদ্ধতি পরিচালিত হয়। তবে এক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলায় ইলিয়াস শাহি, রাজা কংস, হাবসি, হোসেন শাহি, শূর ও কররানি আমলে প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থায় কিছুটা সংস্কার ও পরিবর্তন করা হয়। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায়, বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ সর্বক্ষেত্রে স্বাধীন হলেও বিচার ব্যবস্থায় পবিত্র কোরআন ও শরয়ী আইন প্রতিপালন করতেন। সুলতানদের ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রীয় শাসন ও বিচারকার্যে ইসলামী শরয়ী বিধান প্রয়োগ করা হতো। They administered justice in accordance with the sacred laws of Islam, the Sharia.[৮] উল্লেখ্য যে, স্বাধীন বাংলার শাসন ও বিচার ইসলামী শরয়ী আইন অনুসারে পরিচালিত হলেও বাংলায় একটি রাজতন্ত্রের অনুরূপ শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। কোন সময়েই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। কোন কোন সুলতান সরাসরি খলিফার সনদ বা স্বীকৃতি লাভ করেন। আব্বাসীয় খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহর নাম অঙ্কন করে মুদ্রা জারি করেছেন। কোন কোন সুলতানের শাসনামলে আব্বাসীয় খলিফার নামে খুৎবা পাঠ করা হতো। খিলাফতের প্রতি আনুগত্য থাকলেও সেই আনুগত্য ছিল দলিলপত্রে। মূলত বাংলার সুলতানগণ স্বাধীন ও সার্বভৌম ছিলেন। বাংলার সুলতানগণ তাঁদের শাসনামলে মুদ্রায় সুলতানের নাম প্রচার এবং শুক্রবারের জুমার খুৎবায় নাম পাঠ করা সার্বভৌমত্বের লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

অন্যান্য সুলতানদের ন্যায় বাংলার সুলতানগণ বিভিন্ন উপাধি ধারণ করে রাজ্য শাসন করতেন। রাষ্ট্রের প্রধান প্রশাসক, সামরিক প্রধান এবং প্রধান বিচারপতি হিসেবে সুলতান মূখ্য ভূমিকা পালন করতেন। যা তাঁদের গৃহিত উপাধি দৃষ্টে পর্যবেক্ষণ করা যায়। বাংলার সুলতানদের জারীকৃত মুদ্রা ও বিভিন্ন শিলালিপি থেকে প্রাপ্য উপাধিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল '*সুলতান-উল-আজম* (মহান সুলতান), *সুলতান-উল-মুয়াজ্জম*,

---

[৮]. Mohammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal, Volume-1B,* Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh P. 725

সুলতান-উল-আদিল (ন্যায়পরায়ণ সুলতান), *ইমাম-উল-আজম* (বড় নেতা) ও *সিকান্দর-উস-সানি* (দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার) ইত্যাদি'।

বাংলার সুলতানগণ সকল ক্ষমতার উৎস ছিলেন। সুলতান আইন ও ন্যায়বিচারের রক্ষক ছিলেন। আইনবিশারদ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আবদুর রব বলেন, 'সুলতান ঘটনাবলি নিয়ন্ত্রণ করেন, অধিকার বজায় রাখেন, অপরাধমূলক আইন প্রয়োগ করেন; সুলতান ছিলেন ধ্রুব নক্ষত্র, তাঁর চারদিক ঘিরে রাজ্যের ঘটনাবলি সংঘটিত হয়; তাঁর রাজ্যে তিনি সৃষ্টিকর্তার আশ্রয়ের প্রতিরূপ; তাঁর উপর সৃষ্টিকর্তার ছত্রছায়া বিস্তারিত; তিনি নিষিদ্ধকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন, উৎপীড়িতদের সাহায্য করেন, অত্যাচারিকে নির্মূল করেন এবং ভীরুদের নিরাপত্তা বিধান করেন।[৯] মধ্যযুগের বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলে প্রশাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও বিচারিক কাজ নিষ্পন্ন করতেন। সেইসময় পৃথক বিচার বিভাগও ছিল। বিচার বিভাগকে *দিউয়ান-ই-কাজা* বলা হতো। সুলতানী বাংলায় *দিউয়ান-ই-কাজা'র* দায়িত্বে ছিলেন প্রধান বিচারপতি। তাঁর উপর *দিউয়ান-ই-রিসালাত* এর দায়িত্বও ছিল। সুলতান বিচার প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তি ছিলেন। রাজ্যে সংঘটিত গুরুতর অপরাধ সমূহের বিচার সুলতান নিজে করতেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিটে বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা সেদিকে সুলতান সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। বিচারিক কাজে সুলতানের ঘোষিত ও প্রচারিত রায় সর্বোচ্চ ও অলঙ্ঘনীয় ছিল। জনগণের অভিযোগ ও প্রার্থনা সুলতান সরাসরি শ্রবণ করতেন এবং তাঁর সমাধান দিতেন। সুলতানের রাজদরবার রাজ্যের সর্বোচ্চ বিচারালয় বলে গণ্য হতো। তাছাড়া সুলতানী বাংলায় দিল্লীর আদলে প্রধান কাজীর আদালত, রাজধানীর আদালত, প্রাদেশিক, জেলা, পরগণা ও গ্রাম পঞ্চায়েতে বিচার কাজ পরিচালনা করার জন্য স্বতন্ত্র আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বিচার কাজ সম্পন্ন করতে সৎ, দক্ষ, ইসলামী শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন, সর্বাপেক্ষা মর্যাদা সম্পন্ন ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের *কাজী* পদে নিয়োগ দেয়া হতো। সুলতান *কাজী* নিয়োগ করতেন। ন্যায়বিচারের স্বার্থে *কাজী*দের রদবদল, অপসারণ ও পদায়ন ইত্যাদি সুলতানের মর্জি মাফিক হতো।

---

[৯] প্রফেসর মোঃ আবদুল করিম, *বাংলায় মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ইতিহাস*, ঢাকা, রুদ্র প্রকাশ, ২০২২, পৃ. ৪১

সুলতান তাঁর বিচারকার্য সম্পন্ন করতে *কাজী*, *মুফতি*, *মৌলভী*, *আখুন্দ*, *আলেম* প্রমূখ ইসলামি শাস্ত্রবিধ ও বুদ্ধিজীবীদের সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যায়, সুলতানী বাংলায় ফৌজদারী অপরাধের বিচারের জন্য ফৌজদারী আদালত এবং দেওয়ানী প্রকৃতির অপরাধের বিচারের জন্য দেওয়ানী আদালত গঠন করা হয়। বিচারিক ও প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্রে গুপ্তচর বা গোয়েন্দা এবং কোতোয়াল বা পুলিশ সার্বিক সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করত। বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসনামলে নিম্ন আদালতের বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ উচ্চ আদালতে আপীল করতে পারতেন। আঞ্চলিক বিচারকের রায়, আদেশ ও দন্ডের বিরুদ্ধে সুলতানের দরবারে আপীল করা যেতো। সুলতান নিম্ন আদালতের রায় ও আদেশ পুনর্বিচার করে চুড়ান্ত ডিক্রি প্রচার করতেন। বিচারে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের শাস্তির বিধান ইসলামী আইন অনুসারে করা হতো। বাংলার স্বাধীন সুলতানগণের সময়ে অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাজা ভোগ করতে হতো। এক্ষেত্রে কোন্ অপরাধের কী সাজা হবে তা সুনির্দিষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। সাধারণত আদালতের বিচারিক প্রক্রিয়ায় দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড, বেত্রাঘাত, কারাবাস ও জরিমানা প্রদান করা হতো বলে তথ্য পাওয়া যায়। এমনকি বন্দি করার প্রমাণও আছে; মোহাম্মদ শীরান খলজি আলী মর্দানকে বন্দি করেন এবং আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সনাতনকে বন্দি করেন।[১০] উল্লেখ্য যে, বাংলার সুলতানগণ রাষ্ট্র ও বিচার বিভাগের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও আইনের উর্ধ্বে ছিলেন না। তারাঁ তাঁদের কৃত কাজের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। সুলতান কোনো অন্যায় কাজ বা সীমালঙ্ঘণ করলে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হতো। দেখা যায়, বাংলার সুলতানগণের মধ্যে অনেকেই বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন। এক্ষেত্রে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের শাসনামলে সুলতানকে সোনারগাঁও এর বিচারক কাজী সিরাজ-আল-দ্বীন এর ফরমান (সমন) পেয়ে আদালতে উপস্থিত হওয়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

বাংলার মুসলিম শাসন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা দূরূহ। বাংলার প্রশাসন ও বিচার বিভাগ সম্পর্কে তথ্যের অপ্রতুলতাই এর মূখ্য কারণ। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে দীর্ঘকাল কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি।

---

[১০] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানি আমল)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৬

সমসাময়িক বিবরণমূলক গ্রন্থের অভাবে বাংলার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচারিক বিষয়ে ধারণা লাভ করা কঠিন। বাংলার মুসলিম শাসনামলের ইতিহাস মুসলিম আমলে রচিত হয় নি।

মুসলিম শাসনামলের ইতিহাস মূলত বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর লিখিত হয়। জর্জ উডনি নামক জনৈক ইংরেজ কর্মকর্তার অনুরোধে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ গোলাম হোসেন সলিম জায়েদপুরি সর্বপ্রথম বাংলার মুসলিম শাসনামলের উপর পূর্ণাঙ্গ বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ *রিয়াজ-উস-সালাতিন* রচনা করেন।

পরবর্তীতে *রিয়াজ-উস-সালাতিন* গ্রন্থের উপর নির্ভর করে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে চার্লস স্টুয়ার্ট তাঁর গ্রন্থ *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল* রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থ অনেকটা *রিয়াজে*র ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থের মতো। এরপর উনবিংশ শতক থেকে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দেশি-বিদেশি ইতিহাসবিদগণ বাংলার ইতিহাসের প্রামাণ্য সূত্র আবিষ্কারে নিয়োজিত হয়। তাঁরা মূলত সমসাময়িক শিলালিপি, মুদ্রা, স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন, আরবি, ফারসি, বাংলা পাণ্ডুলিপি উদঘাটন করে বাংলার মুসলিম শাসনামলের ইতিহাসের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন। এসব তথ্য বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ঢাকা জেলার রূপগঞ্জ থানার অন্তর্গত রায়পুর গ্রামে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের তথ্য সম্বলিত ৩৪৬ টি মুদ্রার ভাণ্ডার তামার লোটায় মাটির নিচ থেকে আবিষ্কৃত হয়। অন্যদিকে ইউরোপিয় পর্যটকদের ভ্রমণ কাহিনী থেকে বাংলার ইতিহাসের উৎস পাওয়া যায়। যে সকল ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বাংলার ইতিহাস রচনার মহৎ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাঁরা হলেন- এডওয়ার্ড টমাস, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হেনরি ব্লকম্যান, এইচ এ স্ট্যাপলটন, মনোমোহন চক্রবর্তী, খান সাহেব আবদুল ওয়ালী, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, নলিনিকান্ত ভট্টশালী, আবদুল করিম, সুখময় মুখোপাধ্যায় ও সুনীতি কুমার কানুনগো সহ আরো অনেক নাম যোগ করা যায়।

এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলার ইতিহাস রচনায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যা হলো- আর. সি. মজুমদারের সম্পাদনায় ১৯৪৩ সালে *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, ভল্যুম-১ (হিন্দু আমল) এবং জে. এন সরকার সম্পাদিত *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, ভল্যুম-২ (মুসলিম আমল) ১৯৪৮ সালে প্রকাশ করে।

স্বাধীন বাংলায় দু'শো বছরের শাসন কোনো এক গোত্র বা বংশ এককভাবে পরিচালনা করতে পারেনি। নানান প্রেক্ষাপটে কয়েকটি বংশ বাংলা শাসন করেছিল। ইলিয়াস শাহী, রাজা কন্‌স, হাবসী, হোসেন শাহী বংশ বাংলা শাসন করেছেন। এদের মধ্যে হোসেন শাহী রাজবংশ দীর্ঘকাল বাংলা শাসন করেছেন। অন্যদিকে ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলাকে একত্রিত করে একক শাসনভূক্ত করেছিলেন। একারণে তাকে *শাহ-ই-বাঙ্গালা* বলা হতো। বাংলার সুলতানী শাসনামলের মধ্যে হোসেন শাহী আমল (১৪৯৪-১৫৩৮ খ্রিঃ) ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। এসময় বাংলার প্রশাসন, আইন ও বিচার, অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং ধর্ম সবক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁও এর স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে হোসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে পতন পর্যন্ত পুরোপুরি দু'শো বছর অবিচ্ছিন্নভাবে বাংলার জনগণ স্বাধীনতা ভোগ করেছিল। এসময়ে বাংলার সুলতানগণ তাঁদের যোগ্যতা, শক্তি, ন্যায়পরায়ণতা ও ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়ে বাংলা শাসন করে শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের অন্যতম হয়েছিল। তাঁরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, বাংলার জনগণের আস্থা ও ভালবাসা অর্জন করে অপরিসীম নেতৃত্বের দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। বাংলার ইতিহাসে এ দু'শো বছর গৌরবময় অধ্যায় হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে।

গবেষণার কারণঃ

আলোচ্য বাংলার বিচার ব্যবস্থা (১৩৩৮-১৫৩৮) শিরোনামে গবেষণার একটি প্রেক্ষাপট রয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে অধ্যয়নকালে সর্বপ্রথম প্রশাসনের উপর একটি কোর্সের সাথে আমার পরিচয় ঘটে। পরবর্তীতে আইনের উপর এলএল.বি ডিগ্রিতে ভর্তি হলে *লিগ্যাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গ'* নামক একটি বিশেষ কোর্স অধ্যয়নকালে বাংলার বিচার প্রশাসনের বিষয়ে জানতে আগ্রহী হই। এছাড়াও গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের (১৩৫৮-১৪৯০ খ্রিঃ) সময়ে সোনারগাঁওয়ের কাজী সিরাজ-আল-দিনের আদালতে সুলতানের বিচারের মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টি আমাকে

বেশি আকর্ষণ করেছে। এমনকি বাংলার আইন, বিচার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনুসন্ধানী হতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

বর্তমান বিচার ব্যবস্থার উদ্ভব ও বাংলার বিচারব্যবস্থা বিশেষ করে স্বাধীন সুলতানী বাংলার (১৩৩৮-১৫৩৮) বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তাছাড়া বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের প্রশাসন, আইন, বিচার বিভাগ, বিচারব্যবস্থার প্রায়োগিক পদ্ধতি, আদালত, *কাজী* বা বিচারক, আদালতের ক্ষমতা ও এখতিয়ার এবং শাস্তির ধরণ ইত্যাদির বিষয়ে আধুনিক কালে তেমন কোনো মৌলিক গবেষণা হয় নি। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই স্বাধীন সুলতানী বাংলার বিচার ব্যবস্থা (১৩৩৮-১৫৩৮) Judicial System of Bengal (1338-1538) শীর্ষক মৌলিক গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করার দূরূহ কাজটি গ্রহণ করলাম।

আমার জানা মতে, আজ অবদি এই বিষয় সংশ্লিষ্ট কোনো এম.ফিল ও পি.এইচ.ডি গবেষণা হয় নি। যদিও বাংলার সামগ্রীক ইতিহাসের উপর কিছু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে; যেগুলো মিশ্রিত ও খণ্ডিত। এককভাবে বাংলার বিচার ব্যবস্থার উপর পূর্ণাঙ্গ কোনো প্রবন্ধ বা গবেষণা হয় নি। ফলে উক্ত বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ ও তথ্য-উপাত্ত নির্ভর গবেষণার প্রয়োজনের তাগিদে আমার এ ক্ষুদ্র গবেষণা কর্মটি করার প্রচেষ্টা চালিয়েছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক. বাংলায় সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা

খ. বাংলার সামাজিক অবস্থা

গ. বাংলার ধর্মীয় অবস্থা এবং

ঘ. বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

ক. বাংলায় সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি। তাঁর বাল্য জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি ছিলেন জাতিতে তুর্কি এবং বৃত্তিতে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। বখতিয়ার খলজি আফগানিস্তানের গরমসির বা আধুনিক দশ্‌ত-মার্গোর অধিবাসী ছিলেন। জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় গজনীতে সুলতান মুইজুদ্দীন মহম্মদ বিন সামের নিকট এসেছিলেন। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে স্বদেশ পরিত্যাগ করেন। গজনীতে সুলতান ঘুরীর সৈন্য বিভাগে চাকুরীর প্রার্থী হয়ে ব্যর্থ হন। তখনকার দিনে চাকুরী পেতে হলে প্রত্যেক সৈন্যকে নিজ নিজ ঘোড়া এবং যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করতে হতো। সামর্থের অভাবে তিনি (খলজি) তা যোগাড় করতে পারেননি। তাছাড়া বখতিয়ার খলজির দেহাবয়ব আকর্ষণীয় ছিল না। যা সৈন্য বিভাগে চাকুরী প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রাথমিক যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হত। বখতিয়ার আকৃতিতে খাট এবং দেখতে কুৎসিত এবং 'আজানুলম্বিত' বাহুর অধিকারী ছিলেন।[১] দৃঢ়কায়, দ্রুতগামী, সাহস এবং সমর-নিপুণ হয়েও বখতিয়ার শ্রীহীন ছিলেন।[২] এতদ্ব্যতীত খাট, লম্বা হাত এবং কুৎসিত চেহারার বখতিয়ার হয়তো *আরিজ* (সৈন্য বিভাগের অধ্যক্ষ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নি। যাই হোক, বখতিয়ার গজনীতে ব্যর্থ হয়ে দিল্লীতে আসেন। দিল্লীর শাসন কর্তা ছিলেন কুতুবউদ্দিন আইবক। কুতুবউদ্দিন আইবক (১২০৬-১২১০ খ্রি:) মুহাম্মদ ঘুরীর একজন বিশ্বস্ত দাস ছিলেন। দিল্লীশ্বর সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের শাসন সময়ে বাংলাদেশে পবিত্র এসলাম (ইসলাম) ধর্মের জ্যোতিঃপ্রকাশের সুত্রপাত হয়।[৩] কিন্তু তাঁর (ইখতিয়ার) চেহারা খুব খারাপ হওয়ায় সৈন্যদলে ভর্তি হতে পারেননি। দিল্লীর *দিওয়ান-ই-আরজ্‌* তাঁর খর্ব্বতার জন্য তাকে সৈন্য শ্রেণি ভুক্ত করেন নি।[৪]

তথ্যসূত্রঃ

---

১. অনিরুদ্ধ রায়, *মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস সুলতানী আমল*, হায়দ্রাবাদ, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, প্রথম প্রকাশ ২০০৫, পৃ. ২৩

২. শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত, গোলাম হুসেন সলীম বিরচিত *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ২০১৯, পৃ. ৫৫

৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

৪. শ্রী রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯, পৃ. ১৩।

দিল্লী থেকে বখতিয়ার বদাউনে যান। বদাউনের শাসনকর্তা মালিক হিজবর উদ্দিন বখতিয়ার কে নগদ বেতনে চাকুরিতে ভর্তি করেন। বখতিয়ারের ন্যায় উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি সামান্য বেতনভোগী সৈনিক পদে তৃপ্ত থাকতে পারেন নি। মিনহাজের মতে, বখতিয়ারের এটাই প্রথম চাকুরি, ইসামী বলেছেন বখতিয়ার প্রথমে জিতুরের রাজা জয়সিংহের সিংহলের কাছে চাকুরি পান।[৫] কিছুদিন বদাউনে চাকুরি করার পর বখতিয়ার অযোধ্যায় গমন করেন। অযোধ্যার শাসন কর্তা মালিক হুসাম-উদ-দীন বখতিয়ার খলজির প্রতিভা অনুধাবন করেন এবং তাকে ভিউলি ও ভাগত নামে দুটি পরগনার জায়গীর প্রদান করেন।[৬] এই গ্রামদ্বয়ের নাম সম্বন্ধে ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখতে পাওয়া যায়। *তবাকাৎ-ই-নাসিরী*'র মূলে সহলৎ বা সহলস্ত ও সহিলী বা সহওয়ালী মূদ্রিত আছে।[৭] বখ্‌শী নিজাম-উদ্দিন আহমদের *তবকাৎ-ই-আকবরি*তে কম্পিলা ও পতিআলী নাম দেখতে পাওয়া যায়।[৮] গোলাম হোসেন সলিমের *রিয়াজ-উস-সালাতিনে* 'কম্বালা' ও 'বিটালী' নাম পাওয়া যায়।[৯] এখানে বখতিয়ার তার ভবিষ্যৎ উন্নতির উৎস খোঁজে পান এবং ভাগবত ও ভিউলি তাঁর শক্তি কেন্দ্র হয়ে উঠে। ভিউলি এবং ভাগত আধুনিক উত্তর প্রদেশের মীর্জাপুর জেলায় অবস্থিত।[১০]

অন্যদিকে বখতিয়ার তাঁর জায়গীর সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যগুলো দখল করতে শুরু করলেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো নিজেদের মধ্যে অর্ন্তবিরোধে জড়িয়ে পড়ায় বখতিয়ারের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। তিনি এই রাজ্যগুলোর অনৈক্য ও বিরোধের কারণে একে একে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য গুলো বিনা যুদ্ধে দখল করতে থাকেন এবং তাদের প্রচুর ধন সম্পদ লুণ্ঠণ করতে থাকেন। ফলে বখতিয়ারের বীরত্বের কথা ছড়িয়ে পড়তে লাগল, এমনকি দিল্লীর শাসনকর্তা কুতুবউদ্দিন আইবকের কানেও পৌছায় এবং ভাগ্যান্বেষী অনেক - সৈন্য বখতিয়ারের দলে যোগদান করেন।

---

৫. অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

৬. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ৮১

৭. শ্রী রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

৯. শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

১০. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

বখতিয়ারের সৈন্য সংখ্যা ক্রমপর্যায়ে বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং বখতিয়ার বড় কিছু করার পরিকল্পনা করেন। এভাবে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কম রক্তক্ষয় করে বেশি অর্থ সংগ্রহ করা। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে যেখানে দূর্গ নেই বা বড় কোন সৈন্যদল নেই, ওইসব জায়গায় আক্রমণ করাই ছিল তাঁর (বখতিয়া্র) কৌশল। এভাবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে একদিন তিনি এক প্রাচীর বেষ্ঠিত দূর্গের মতো স্থানে আসেন এবং আক্রমণ করেন। মিনহাজ বলেছেন বখতিয়ার মাত্র দু’শো অশ্বারোহী নিয়ে বিহার আক্রমণ করেন। বাধাহীন ভাবে দূর্গটি জয় করেন । এই প্রাচীর বেষ্টিত দূর্গটি অধিকৃত হওয়ার পর তিনি লক্ষ্য করেন যে, সেখানকার অধিবাসীরা সকলেই মুণ্ডিত মস্তক এবং স্থানটি বই পুস্তকে পরিপূর্ণ ছিল। ইতিহাস লেখকগণ বলেছেন, এটি “বিহারে হিন্দুর পুস্তকালয় ছিল”।[১১] এই সমগ্র নগর একটি বিদ্যালয় ছিল। হিন্দু ভাষায় বিদ্যালয়কে বিহার বলে।[১২] আপাতভাবে মনে হয় ওটি ছিল বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়।[১৩] সম্ভবত এটা বৌদ্ধদের আশ্রম।[১৪] বৌদ্ধবিহার এবং মুণ্ডিত মস্তক লোকগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষু।[১৫] এটা জানা গেল যে, পুরো দূর্গ এবং নগর ছিল একটি বিদ্যা চর্চার কেন্দ্র।[১৬] বিহারটির নাম ছিল ওদন্দবিহার বা ওদন্তপুরী বিহার অর্থাৎ বখতিয়ার খলজি ওদন্তপুরী বিহার জয় করেছিলেন। এই সময় থেকেই মুসলমানেরা ওই স্থানের নাম দিলেন বিহার এবং আজ পর্যন্ত শহরটি বিহার বা বিহার শরীফ নামে পরিচিত।[১৭] বিহার পাটনা জেলার একটি মহকুমা ছিল।

---

[১১] শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

[১২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

[১৩] সতীশ চন্দ্র, *মধ্যযুগের ভারত (১ম খণ্ড) সুলতানী আমল থেকে মুঘল আমল দিল্লী সুলতান (১২০৫-১৫২৬ খ্রি.)*, কলকাতা, বুক পোষ্ট পাবলিকেশন, ২০১৭, পৃ. ৩৪

[১৪] অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

[১৫] আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২

[১৬] সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস (১২০৪-১৫৭৬ খ্রিঃ)*, *সুলতানী আমল*, ঢাকা, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৫, পৃ. ৪

[১৭] ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০১৯, পৃ. ১৫০

বিহার বিজয়ের পর বখতিয়ার খলজি অনেক ধন-সম্পদ নিয়ে কুতুবউদ্দিন আইবকের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। বখতিয়ার সুলতানকে বিংশতিটি হস্তী এবং নানা প্রকারের রত্ন ও কিঞ্চিৎ অর্থ উপঢৌকন দিয়েছিলেন।[১৮] ৫৯৯ হিজরি বা ১২০২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক কালিঞ্জর দূর্গ অধিকার করেছিলেন। এই ঘটনার পরে ৫৯৯ হতে ৬০০ হিজরায় বা ১২০২ হতে ১২০৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বখতিয়ার সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবকের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। কুতুবউদ্দীন আইবকের সঙ্গে বখতিয়ার খলজির উপরোক্ত সাক্ষাৎকার নিয়ে ঐতিহাসিকদের ভিন্ন মত পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক হাসান নিজামী বলেছেন যে, ওই সাক্ষাৎ হয় ২৩শে মার্চ ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বদাউনে।[১৯] কুতুবউদ্দিন তাঁকে (বখতিয়ার) প্রভূত মান এবং পুরস্কৃত করলেন। যখন বিদায় গ্রহণ করেন তখন কুতুবউদ্দিন তাকে একটি তাম্বু, নৌবৎ, একটি নাকারা, একটি নিশান, একটি সুসজ্জিত অশ্ব, একটি কমরবন্দ, একখানি অসি ও একটি বহুমূল্য খিলাৎ প্রদান করেছিলেন।[২০] খিলাৎ হলো একটি বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার চিহ্ন । *তবাকাৎ-ই-আকবরী* প্রণেতা বখশী নিজাম উদ্দিন মহম্মদ বলেন যে, ইখতিয়ার উদ্দিন সুলতান কুতুব উদ্দিনের অধীনে কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন।[২১] এরপর বখতিয়ার আরো সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং পরের বছর নদীয়া আক্রমণ করেন। তখন বাংলায় লক্ষণ সেন রাজত্ব করছেন। এই বয়োবৃদ্ধ তাঁর সুবিচার ও বদান্যতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বখতিয়ার নদীয়াতে আক্রমণ করবেন এই খবর ছড়িয়ে যায়। তাই রাজা লক্ষণ সেনকে তাঁর রাজ্যের দৈবজ্ঞ, পণ্ডিত ও ব্রাক্ষণগণ রাজাকে আগেই সতর্ক করেছিলেন। এই সময়ে বাংলাদেশের রাজা লক্ষণ সেন রাজধানী নদীয়াতে অবস্থান করছিলেন। বখতিয়ারের আক্রমণের সতর্ক সংবাদ সম্পর্কে অবগত হয়েও লক্ষণ সেন নদীয়া ত্যাগ করেননি। বখতিয়ারের আক্রমণের খবরে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রাক্ষাণ ও বণিকরা শহর ছেড়ে পূর্ব বঙ্গে ও কামরূপে পালিয়ে যায়। মিনহাজের বর্ণনায় দেখা যায় যে, বখতিয়ার কর্তৃক বিহার জয়ের পর সেন সাম্রাজ্যে গভীর ভীতি বিদ্যমান ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে উক্ত ভীতির ফলে রাজা শান্তি যজ্ঞ পালন করেছিলেন।

১৮.রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

১৯. অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

২০. রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, ১২০৩ খিস্টাব্দে রাজা লক্ষণসেন ‘মহাশান্তি’ যজ্ঞ করেছিলেন।[২২] লক্ষণ সেনের তাম্র শাসনে ঐন্দ্রিয় মহাশক্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উল্লেখ এই ভীতির কথাই প্রমাণ করে। সম্ভবত এঁদের আশ্বস্ত করার জন্যই লক্ষণসেন ‘পর-চক্র-ভয়’ দূর করার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।[২৩] যাইহোক, বখতিয়ার বিহার থেকে ঝাড়খন্ডের মধ্য দিয়ে সৈন্য নিয়ে নদীয়াতে এসেছিলেন। নদীয়া আক্রমণের সময় বখতিয়ারের সৈন্য সংখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখতে পাওয়া যায়। মিনহাজ বলেছেন যে, মাত্র আঠারো জন অশ্বারোহী নিয়ে বখতিয়ার নদীয়া শহরের দরজায় আসেন।[২৪] সমসাময়িক ইতিহাস *তবকাত-ই-নাসিরি* তে বখতিয়ার খলজি কর্তৃক নদীয়া বিজয় সম্পর্কে উপরোক্ত সামান্য তথ্য পাওয়া যায় এবং এই সুত্রে আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, ১৭ জন অশ্বারোহী বাংলাদেশ জয় করেন।[২৫] এত ক্ষিপ্রতায় তিনি (বখতিয়ার) অগ্রসর হন যে মাত্র ২৮ জন অশ্বারোহী তাঁর (বখতিয়ার) সাথে তাল রাখতে পারেন।[২৬] বখতিয়ার শুধু দূর্ধর্ষ বীরই ছিলেন না, তিনি একজন কৌশলী সমর নীতিবীধও ছিলেন। বখতিয়ার নদীয়া আক্রমণের সময় তখন দুপুর বেলা ছিল; যখন লোকেরা স্নান, খাওয়া ও বিশ্রামের সময়, তাই এদের নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় নি। মিনহাজ লিখেছেন যে, লোকে তাদের অশ্ব বিক্রেতা মনে করেছিল। ফলে বখতিয়ার তাঁর সৈন্য নিয়ে রাজা লক্ষণ সেনের প্রাসাদ-দ্বারে বিনা বাধায় পৌছে যায়। বখতিয়ার নদীয়াতে অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে সুপরিকল্পিত ভাবে একটি আকস্মিক আঘাত করেছিলেন। বখতিয়ারের সৈন্য দল পিছনে এসেছিল। মূল বাহিনী পশ্চাতে ছিল। তিনি নিজ সৈন্য বাহিনীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করেন। প্রাসাদে পৌছেই বখতিয়ার আক্রমণ হানেন। তিনি সোজা রাজা লক্ষণ সেনের প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হন এবং প্রাসাদ রক্ষীদের হত্যা করেন। রাজা লক্ষণ সেন তখন দুপুরের খাওয়ার জন্য বসেছিলেন। প্রচলিত নিয়মানুযায়ি সোনার ও রুপার পাত্রে খাদ্য ভরে তার সামনে রাখা হচ্ছিল। আক্রমণের শোর চিৎকার রাজার কানে আসে।

---

[২২] অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

[২৩] সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

[২৪] অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

[২৫] আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২

[২৬] সতীশ চন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

প্রাসাদের দরজায় ও নগরে একই সঙ্গে শোর চিৎকার উঠেছিল। তিনি হতচকিত হয়ে যান। অতর্কিত আক্রমণে বিমূঢ় হয়ে লক্ষণ সেন পলায়ন করেন। রাজা লক্ষণ সেনের আশ্রয় নেয়ার স্থান নিয়ে ইতিহাসবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। খবর শুনে তিনি পশ্চাৎদ্বার দিয়ে পলায়ন করেন এবং নৌ পথে বিক্রমপুর গিয়ে আশ্রয় নেন।[২৭] লক্ষণসেন ওই অবস্থায় পিছনের দরজা দিয়ে গঙ্গায় পৌঁছে নৌকা করে পূর্ববঙ্গে চলে যায়।[২৮] গোলাম হোসেন সলীম বলেন- বর্ষীয়ান রাজাও রাজ্য রক্ষার আশা পরিত্যাগ করে অতিমাত্র ভয়-ব্যাকুল হৃদয়ে নগ্নপদে পুরীর পশ্চাতদ্বার পথে বহির্গত হয়ে নৌকা যোগে কামরূপ অভিমুখে পলায়ন করলেন।[২৯] প্রায় বিনা বাধায় বখতিয়ার নদীয়া জয় করেন। বখতিয়ার বহু মূল্যবান ধন রত্ন অর্জন করেন। রাজার স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলাদের এবং চাকর ও রক্ষীদের ধরে ফেলেন। তারা বহু হাতি ও ধনরত্ন পেয়েছিল। লক্ষণ সেনের সমস্ত সঞ্চিত ধনরত্ন, পত্নী ও অন্যান্য নারী দাস-দাসী সবই বখতিয়ারের হাতে জব্দ হল। মুসলমানরা এত লুণ্ঠণ দ্রব্য লাভ করল, যা গনণা করে শেষ করা যায়না। বখতিয়ার তিনদিন ধরে নদীয়া লুণ্ঠণ করেন এবং নদীয়ার ধনসম্পত্তি হস্তগত করেন। বখতিয়ার কর্তৃক নদীয়া জয়ের তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মত বিরোধ রয়েছে। ১২০৪ সালের শেষে বা ১২০৫ সালের প্রথমে বখতিয়ার প্রথমে নদীয়া ও কয়েকদিন পরে লক্ষ্মণাবতী জয় করেন।[৩০] তবে বর্তমানে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দই নদীয়া জয়ের তারিখ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।[৩১] *তবকাৎ-ই-নাসিরী* ও *তাজ-উল-মাসির* এর উক্তির সমন্বয় সাধন করে আমরা স্থির করতে পারি যে, বখতিয়ার ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বিহার জয় করেছিলেন এবং পরের বছর অর্থাৎ ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি নদীয়া জয় করেন।[৩২] অতপর বখতিয়ার খলজি নদীয়া ত্যাগ করেন, লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) অধিকার করেন এবং সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন।

---

২৭. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১

২৮. অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

২৯. শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

৩০. অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

৩১. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২

৩২. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

বখতিয়ার 'গৌড়' অর্থাৎ লক্ষ্মণাবতী জয় করেছিলেন ৬০১ হিজরির ১৯ শে রমজান অর্থাৎ ১০ই মে, ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে- একথা এখন প্রামাণিক ভাবে জানা গেছে।

বখতিয়ার খলজির একটি নবাবিষ্কৃত গৌড় বিজয় টঙ্কা (স্বর্ণমুদ্রা) থেকে।[৩৩] গৌড় জয়ের পর বখতিয়ার আরো পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বরেন্দ্র বা উত্তর বাংলায় নিজ অধিকার বিস্তার করেছিলেন। বখতিয়ার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলায় মুসলমান রাজ্যের সঠিক সীমা সমসাময়িক সূত্রে স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না।

কিন্তু প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, লক্ষ্মৌতি রাজ্য পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট হয়ে রংপুর শহর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে বখতিয়ার খলজির পূর্ব অধিকৃত বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৩৪]

এভাবে বখতিয়ার একের পর এক রাজ্য জয়ের মাধ্যমে বাংলায় এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাথমিককালে বাংলা বিজিত এলাকা সমূহ দিল্লী সালতানাতের একটি প্রদেশ ছিল। যেহেতু, বখতিয়ার দিল্লী সুলতানের আনুগত্য প্রকাশ করে শাসনকার্য পরিচালনা করেন সেহেতু বাংলায় দিল্লী সুলতানি শাসন বখতিয়ার খলজির মাধ্যমে চুড়ান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। *তবকাৎ-ই-নাসিরী* থেকে জানা যায় যে, বখতিয়ার সুলতান ঘুরির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাছাড়া, বিহার জয়ের পর উপঢৌকন সহ কুতুবউদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং নদীয়া জয়ের পরও তাঁকে ধনরত্ন পাঠিয়েছিলেন। *রিয়াজ-উস-সালাতিন* এর রচনাকার গোলাম হোসেন সলিম বলেন যে, বাংলা রাজ্য দিল্লীর সাম্রাজ্যের অংশস্বরূপ কুতুবউদ্দিনের হস্তে ন্যাস্ত হল এবং সুলতান কুতুবউদ্দিন, মালিক বখতিয়ার খলজিকে বিহার ও লক্ষ্মৌতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করলেন।[৩৫]

বাংলায় বখতিয়ারের শাসনামলে কোনো ব্যাপারে কুতুব উদ্দিন হস্তক্ষেপ করেননি। বখতিয়ার খলজির নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বাংলায় মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। মুসলমান রাজাগণের মধ্যে মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজিই বঙ্গদেশের প্রথম অধিপতি।

---

৩৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

৩৪. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

৩৫.রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

খ. বাংলার সামাজিক অবস্থা

সুলতানি যুগে ভারতের সামাজিক অবস্থা শ্রেণি বৈষম্যের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল। ইবনে বতুতার মতে তৎকালীন বাংলা ছিল হিন্দু প্রধান। জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী। মুসলমানরা বাংলা শাসন করলেও তারা ছিল সংখ্যালঘু। দিল্লীতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর মুসলমান সমাজও প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল পবিত্র কোরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে; কিন্তু মূলত এটি ছিল ইসলাম পূর্ব আরবের সমাজ ব্যবস্থার পরিশীলিত ও পরিমার্জিত রূপ।[১] রাষ্ট্রের উপর ইসলামীয় চরিত্রের প্রভাব থাকলেও সামাজিক সমতার পরিবর্তে সামাজিক স্তর বিন্যাস প্রকট হয়ে ওঠে।[২] বৃত্তিগত ও ধর্মগত দিক থেকে সমাজ জীবনের বিভাজন চোখে পড়ে।[৩] অতএব, দিল্লী ও বাংলা সালতানাতে সমাজকে প্রথমেই হিন্দু মুসলমান দুই ভাগে ভাগ করা যায়। বাস্তবে হিন্দু ও মুসলিমদের জীবনযাত্রায় খুব সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

বাংলার সমাজে মানুষের মধ্যে শ্রেণি বিভেদ ছিল। হিন্দুদের মধ্যে শ্রেণি বিভেদ ছিল প্রখর। এছাড়া মুসলমানদের মধ্যেও এটি ছিল। মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণি ও নিম্ন শ্রেণিভূক্ত লোকজন ছিল। শায়খ, সৈয়দ, সুফি, উলেমা ও আমীর ওমরাহগণ উচ্চ শ্রেণিভূক্ত ছিল। এদের অভিজাত শ্রেণিও বলা হয়। অভিজাত সম্প্রদায় উচ্চস্তরে খান, মালিক ও আমিল এই তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল।[৪]

তথ্যসূত্রঃ

---

১. ড. মোঃ শফিকুর রহমান, *বাংলাদেশে আইন বিচার ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ*, ঢাকা, কামরুল বুক হাউস, ২০১০, পৃ. ৭০

২. সতীশ চন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০

৩. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস মধ্যযুগঃ সুলতানি পর্ব*, ঢাকা, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৪, পৃ. ২২৬

৪. সতীশ চন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮

মুসলমান অভিজাত শ্রেণির লোকেরা সামরিক বেসামরিক উচ্চ পদ যেমন লাভ করতেন, তারা ব্যবসায়েও লিপ্ত থাকতেন। সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন অভিজাত গোত্রের লোক ছাড়া কাউকে কখনো সরকারি উচ্চপদে বহাল করতেন না।[৫]

অন্যদিকে কর্মজীবী, দোকানদার, কৃষক, দাস-দাসী ও ছোট ব্যবসায়ীরা ছিল নিম্ন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত । মুসলিম সমাজের নিম্নতর স্তরে অবস্থান করত কারিগর, দোকানি, করণিক এবং ক্ষুদ্র বণিক গোষ্ঠী।[৬] হিন্দুরা মূলত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইত্যাদি শেণিতে বিভক্ত ছিল। হিন্দু সমাজ ছিল বর্ণ বিভক্ত। মুসলিম শাসনামলে হিন্দুরা উচ্চ রাজপদ হারালেও নিম্ন শ্রেণির চাকুরি প্রায় একচেটিয়া ভাবে অধিকার করে নেয়। অতএব উচ্চ পদ না পেলেও হিন্দুরা নিম্ন ও মধ্যম পদে বহাল থাকে।[৭]

বাংলার মুসলিম সমাজে নানান ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবাদির প্রচলন ছিল। মুসলমান সমাজে উল্লেখযোগ্য উৎসব ছিল নওরোজ, শব-ই-বরাত, মহর্‌রম, ঈদ, উরস ইত্যাদি।[৮] নওরোজ উৎসব ছিল একটি রাষ্ট্রীয় ও জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উভয় উৎসব ছিল মুসলমানদের সবচেয়ে বড় উৎসব। সুফি সাধকদের মাজারেও উরস উৎসব পালন করা হত। নওরোজ উৎসব এবং অন্যান্য উৎসবের দিনে খোলা মাঠে বা মঞ্চে নাচ-গান এবং মদপানের ব্যবস্থা করা হত, সুলতানেরাই প্রজা সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য উৎসবের দিনে বিনামূল্যে পানাহার সরবরাহ করতেন।[৯] সে যুগে উত্তেজক সুরাপান ছিল সাধারণ অভ্যাস।[১০]

---

৫. ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস (৭১২-১৯৭১ খ্রিঃ)*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১৮, পৃ. ১৩০

৬. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭

৭. আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস মুসলমান আমল*, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০২০, পৃ. ১৩৮

৮. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮

৯. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

১০. ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০.

এখানে তিন-চার রকমের মদ পাওয়া যায়- নারিকেল, ধান, তাড়ি এবং কাজাঙ্গ থেকে তৈরি।[11] ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ জীবনে পানের কদর অত্যন্ত বেশি, স্মরণাতীতকাল থেকে পানের দ্বারা অতিথি আপ্যায়ণ করা সমাজের রেওয়াজ ছিল।[12] চা নাই বলে এরা অতিথিকে তার জায়গায় পান খেতে দেয়।[13] দিল্লীর সুলতানেরা কম বেশি সঙ্গীত ও নাচ পছন্দ করতেন। তারা (সঙ্গীতজ্ঞ) প্রত্যেক দিন রাজকর্মচারি ও ধনীদের বাড়িতে সানাই, ছোট ও বড় ঢাক বাজায়।[14] তৎকালীন সমাজে বিভিন্ন ধরনের জনপ্রিয় খেলাধুলার প্রচলন ছিল। জুয়া, দাবা, পলো, শিকার ও ঘোড় দৌড় ইত্যাদি দেখা যেত। উল্লেখ্য যে, জুয়া খেলা ও ভাঙ খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।[15] আবাসিক খেলাধুলার মধ্যে দাবা ও পাশা খেলা সকলের প্রিয় ছিল।[16] তারা চৌগান (বর্তমানে পলো খেলা), অশ্বারোহণ, দৌড়, শিকার এবং অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে প্রচুর আমোদ পেতেন এবং সময়ে সময়ে এসব খেলাধুলায় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করত।[17] মুসলমানদের জীবনে আকিকা, খৎনা, বিবাহ এবং দাফন-কাফন ক্রিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; যদিও এগুলি মোটামুটিভাবে ধর্মীয় বিধান মতে সম্পন্ন করা হয়।[18] হিন্দু ও মুসলিম উভয় শ্রেণির মহিলারাই তাদের স্বামী বা অন্যান্য পুরুষ আত্মীয় স্বজনের উপর নির্ভর ছিলেন।[19] বাংলার মুসলিম সমাজে নারীর স্থান ছিল পুরুষের নিচে। মহিলাদের পর্দার আড়ালে থাকতে হতো। মুসলমান মহিলারা পর্দা ব্যবহার করত এবং পর-পুরুষের দৃষ্টির অন্তরালে থাকত। গ্রাম্য ও অভিজাত শ্রেণির মহিলাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

---

১১. আবদুস সালাম মামুন, *উপমহাদেশের আইন ও শাসনের ইতিহাস*, ঢাকা, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৪, পৃ. ৩৫৪

১২. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

১৩. আবদুস সালাম মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৪

১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৪

১৫. অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

১৬. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেই অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার রীতি ছিল। ছেলে মেয়েদের অল্প বয়সেই বিবাহ দেয়া হতো। বিবাহে যৌতুকের ব্যবহার ছিল। ইবনে বতুতার বর্ণনা থেকে জানা যায়, বিয়ের যৌতুক হিসেবে পরিচারিকা দেয়ার রীতি ছিল।[২০] সেন যুগেও বরকে পণ দেয়ার রীতি ছিল।[২১] মুসলমানদের বিবাহ শরীয়তের বিধি-বিধান মতে সম্পন্ন হত,অন্যদিকে হিন্দুদের বিবাহ তাদের ধর্মীয় শাস্ত্রমতেই হতো। জাত শ্রেণি ভেদে বিবাহের সম্বন্ধ তৈরি হত। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সাথে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ হতো না। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও এই শ্রেণি বৈষম্যের ধারা পরিলক্ষিত হয়।

হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবগুলো ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। হিন্দুদের মধ্যে তাদের ধর্মীয় উৎসব পালা-পার্বণও ছিল। এযুগের সর্বাধিক জনপ্রিয় উৎসব ছিল বসন্ত পঞ্চমী, হোলি, দীপাবলী, শিবরাত্রি।[২২] হোলি বলতে গেলে শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসব ছিল। উচ্চবিত্ত হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। ঐতিহাসিক দলিল লেখক গোঁরাচাঁদ মিত্র তাঁর 'সতীদাহ' গ্রন্থে বলেন- সতীদাহ প্রথা একটি প্রাচীন হিন্দু ধর্মীয় প্রথা যেখানে এক বিধবাকে তার স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে জীবিত পুড়ে দেয়া হতো। স্বামীর সাথে সহমরণের জন্য সুলতানের নিকট হতে বিধবাদের অনুমতি পত্র সংগ্রহ করতে হতো।[২৩] হিন্দুদের মধ্যে বিশেষত রাজপুত সমাজে জহরব্রত প্রথাও চালু ছিল। যা বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলেও লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধে পরাজিত হলে শত্রুর হাতে লাঞ্চিত হওয়া এড়ানোর জন্য মেয়েদের আত্মাহুতি দেয়াকে জহরব্রত বলা হতো।[২৪]

---

[২০] এ কে এম শাহনাওয়াজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯

[২১] আবদুস সালাম মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৪

[২২] এ কে এম শাহনাওয়াজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯

[২৩] ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১

[২৪] এ কে এম শাহনাওয়াজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯

গ. বাংলার ধর্মীয় অবস্থা

স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলার ধর্মীয় অবস্থা মূলত মুসলমান ও হিন্দু শ্রেণির ধর্মনীতি দুটি পৃথকভাবে পালিত হয়েছে। হিন্দুধর্ম বাংলার প্রাচীনতম ধর্ম। ভারত উপমহাদেশে হিন্দু ধর্ম দর্শন বহু আগেই উৎপত্তি হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত বাংলার লোকজন ছিল বৌদ্ধ এবং হিন্দু; মুসলমানরা নিয়ে আসে একটি নতুন ধর্ম ইসলাম; যার সঙ্গে বৌদ্ধ বা হিন্দুদের মিলের চেয়ে গরমিলই ছিল বেশি।[১] খ্রিষ্টীয় সাত শতকেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী আরব বণিকরা ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে বসতি স্থাপন করেছিল।[২] বণিকরা স্থিতি লাভ করে ধর্মীয় প্রেরণায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। স্যার জন মার্শাল মন্তব্য করেনঃ "একত্রে মেলামেশা করা সত্ত্বেও মোহাম্মদীয় ও হিন্দু ধর্মের মত দুইটি বিস্তৃত ও শক্তিশালীভাবে গঠিত, তবুও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দুইটি সভ্যতা মানব ইতিহাসে কদাচ দৃষ্ট হয়।[৩]

সুলতানেরা নিজেদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হিসেবে দাবি করে নানান উপাধি গ্রহণ করত। সিকান্দর শাহ্ (১৩৫৮-১৩৮৯ খ্রিঃ) *আযম জিলুল্লাহ* বা পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া; *আল ইমাম* বা নেতা এবং *আল মুজাহিদ* বা ধর্ম যোদ্ধা ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করেছেন। সুলতান জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ্ (১৪১৮-১৪৩১ খ্রিঃ) ও সুলতান হোসেন শাহ্ (১৪৯০-১৫১৯ খ্রিঃ) নিজেদের *খলিফাতুল্লাহ* বা পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এ সমস্ত পদবি গ্রহণ এটাই নির্দেশ করে যে, সুলতান নিজে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও মুসলিম সমাজ বিস্তারে অগ্রণি ভূমিকা পালনকারী ছিলেন।[৪] মোটের উপর, সুলতানগণ তাঁদের রাজ্য শাসনব্যবস্থায় এবং জনগণের সাথে তাঁদের আচার ব্যবহারে শরীয়তের প্রতি অসাধারণ সম্মান প্রদর্শন করতেন।[৫]

তথ্যসূত্রঃ

---

১. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস, মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত (১২০০-১৮৫৭ খ্রি:)*, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২, পৃ. ১২৩

২. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১

৩. ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩

৪. সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭

৫. এ কে এম আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪, পৃ. ১৭

'কদম রসুল' ভবনের শিলালিপিতে সুলতান হোসেন শাহ্‌কে "ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষক" বলা হয়েছে, কাঁটাদুয়ারের শিলালিপিতে তাঁকে বলা হয়েছে "মুসলিম পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের প্রতি দয়াশীল" এবং জাহানাবাদের শিলালিপিতে তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয়েছে, "যাঁর উদ্যোগে ইসলাম বর্ধিত হচ্ছে"।[৬] বাংলার স্বাধীন সুলতানী যুগে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আলেম ও সুফি-দরবেশদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অসংখ্য সুফি-দরবেশ এদেশে এসে আস্তানা বা খানকা প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম প্রচার করেছেন।[৭] মসজিদ ও সমাধি-সৌধ সুফি ও ধর্ম প্রচারকদের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৮] মুসলমান সুফি এবং আলেমরাই ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সুফিদের চারিত্রিক পবিত্রতা ও দৃঢ়তা লোকদের আকৃষ্ট করেছিলেন। সুফি ও দরবেশদের মধ্যে শায়খ হুসেইন, শিহাব উদ্দিন সুহরাওয়ার্দী, দাতা গঞ্জবখশ লাহোরী, সুফী আব্দুল্লাহ সাত্তারী, নুর কুতুব আলম ও জৌনপুরের আশ্‌রফ সিমনানী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। সুফি সাধকগণ ইসলাম ধর্মের বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন।

মধ্যযুগে বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ঈদুল ফিত্‌র, ঈদুল আযহা, আশুরা, আখেরী চাহার সাম্বা, ঈদে মিলাদুন্নবী, শবে মেরাজ, শবে বরাত ও শবে কদর। মুসলমানদের জীবনে আকিকা, খৎনা, বিবাহ এবং দাফন-কাফন ক্রিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; যদিও এগুলি মোটামুটি ভাবে ধর্মীয় বিধান মতে সম্পন্ন করা হয়।[৯] নামায-রোজার মত ইসলামী বিধি-বিধান পালন করা হতো। গোঁড়া উলেমাদের মতো বাহাউদ্দিন নামায, রোজা প্রভৃতি আচার-অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[১০]

মধ্যযুগে বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় শাখার একটি অন্যতম শাখা ছিল সুফিবাদ। বিশেষত শায়খ হুসেইন, শায়খ শিহাবউদ্দিন সুহরাওয়ার্দী, দাতা গঞ্জবখশ লাহোরী, সুফি-

---

৬. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮)*, ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ২০১৮, পৃ. ৩৮৬

৭. আবদুস সালাম মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩০

৮. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩

৯. আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস মুসলমান আমল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

১০. সতীশ চন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭

আবদুল্লাহ সাত্তারী, সুফি হাসান বসরি, রাবেয়া সানাই, রুমি, জৌনপুরের ইব্রাহিম শর্কী, নুর কুতুব উল আলম ও আশরফ সিম্নানী প্রমুখ দরবেশরাই সুফিবাদের প্রবক্তা হিসাবে ভূমিকা পালন করেছেন। সুফিবাদের চারটি শাখা বা ত্বরিকা রয়েছেঃ ১। চিশতিয়া, ২। কাদেরিয়া, ৩। নক্সবন্দিয়া, ৪। মোজাদ্দেদিয়া।[১১] কারো কারো মতে সুফিবাদ বারোটি সম্প্রদায় বা সিলসিলায় বিভক্ত ছিল। সুফি সিলসিলা গুলি মোটামুটি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল- ০১। বাসারা, অর্থাৎ যারা ইসলামীয় আইনকে মান্য করে চলত ও ০২। বেসারা অর্থাৎ যারা এই আইনে আবদ্ধ থাকেনা।[১২] সুফিবাদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি ধারার মধ্যে চিশতীয়া, সুহরাওয়ার্দীয়া, জুনাইদিয়া, সাত্তারী, কাদেরী, মাদারী বা ওয়ায়েজি ও নকশ্ বন্দি উল্লেখযোগ্য। সালতানাতের আমলে ভারতে চিশতীয়া ও সুহরাওয়ার্দীয়া খুবই শক্তিশালী ও জনপ্রিয় ছিল।

মধ্যযুগের বাংলায় ইসলাম ধর্মে পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটে। ইসলামের ধারকবাহক আলেম, দরবেশ ও সুফিদের আচরণে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে বাংলার মুসলমানদের আকীদাহ্-বিশ্বাস, সমাজ ও সংস্কৃতিতে পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বাংলার শাসনকর্তা আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময় থেকে।[১৩] ড. হবিবুল্লাহ আরও বলেন, "এমনকি শরীয়তের অভিভাবক উলামার অধিকাংশই ছিল সম্পূর্ণরূপে পার্থিব আদর্শের অনুসারী এবং তাদের আচরণ ছিল সুবিধাবাদীর।[১৪] আলেমরা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়েন। রাসুলের হাদীস জাল করে সুলতানের অন্যায় কাজকে সমর্থন করেন। এমনকি পৌত্তলিকতাকে আইন সিদ্ধ বলে ফতোয়া দেয়। শরীয়তের বিধি-বিধান পার্থিব স্বার্থে পরিবর্তন করেন। সুলতানকে রসুলের মর্যাদার সাথে তুলনা করতেও দেখা যায়। স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলায় ধর্মীয় যুদ্ধের ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়। বাংলার রাজা গণেশের ইসলাম ধর্ম বিরোধী কার্যকলাপ ও দমননীতির বিরুদ্ধে তৎকালীন প্রসিদ্ধ দরবেশগণ একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে গণেশকে উৎখাত করতে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

---

[১১] ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

[১২] সতীশ চন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩

[১৩] আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমনদের ইতিহাস*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০২১, পৃ. ৫৯

[১৪] আবদুস সালাম মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৬

নুর কুতুব আলম, জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কী, আশর্‌ফ সিম্‌নানী ও শেখ হুসেন প্রমুখ দরবেশগণ কান্‌স রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে আশ্‌রফ সিম্‌নানীর তিনটি চিঠি উল্লেখযোগ্য। গণেশের অভ্যুদয়ে দরবেশরা চিন্তিত ছিল। ধার্মিক রাজাদের পক্ষে মুসলমান ধর্মের রক্ষার জন্যে সৈন্য বাহিনী পরিচালনা করার চেয়ে আনন্দের কাজ আর কিছুই নেই।[১৫] তৎকালীন বাংলায় ইসলাম ধর্মের আকীদাহ বিশ্বাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মান্তরিত হওয়ার নজীর দেখা যায়। ইসলাম শুরু থেকেই যে ভারতীয় জনমানসে প্রভাব ফেলেছিল তার বড় প্রমাণ সাধারণ ভারতীয়দের পাশাপাশি দেশীয় রাজাদেরও এই নতুন ধর্ম গ্রহণ।[১৬] যদু ধর্মান্তরিত হয়ে জালাল উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন।[১৭] মুসলিম সাধুদের জীবনী গ্রন্থ *মিরাৎ-উল-আসরারে* জালালুদ্দীন সম্বন্ধে কিছু কিছু ভুল উক্তি থাকলেও এই একটি কথা সঠিকভাবে লেখা আছে- “......he became a convert to Islam because of his lust for kingdom” (ড. দানীর অনুবাদ)।[১৮] ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে নিচু বর্ণের হিন্দুরা বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল। শেখ শুভোদয়ার কথা মানলে উনি অনেক হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করেন, যারা প্রধানত ছিল নিচু শ্রেণির।[১৯] নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যে বেশি সংখ্যায় ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছিল, ব্রাহ্মণ কবি মুকুন্দরামের কথায় তার পরিচয় পাওয়া যায়।[২০] হিন্দুধর্ম হল বিভিন্ন দর্শন এবং ভাগ করা ধারণা, আচার, বিশ্বতাত্ত্বিক ব্যবস্থা, তীর্থস্থান এবং ভাগ করা পাঠ্য উৎস দ্বারা চিহ্নিত একটি বৈচিত্রময় চিন্তাধারা যা ধর্মতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, পুরাণ, বৈদিক যজ্ঞ, যোগ ব্যায়াম, আগমিক আচার এবং মন্দির নির্মাণ নিয়ে আলোচনা করে।[২১]

---

১৫. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫

১৬. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২

১৭.আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪

১৮. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬

১৯. অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫

২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪

২১. হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, উইকিপিডিয়া, *https://bn.m.wikipedia.org।*

একাধিক মতের সমাহারই হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্মকে সনাতন ধর্মও বলা হয়। সমসাময়িক গ্রন্থ অনুসারে সনাতন ছিলেন “গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণ মণি”।[২২] মধ্যযুগে হিন্দু সমাজকে চারটি বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছে যা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র নামে পরিচিত ছিল। হিন্দু সমাজ ছিল ধর্ম কেন্দ্রিক, তাদের শিল্প সাহিত্য সবকিছু ধর্মের প্রভাব বলয়ে গড়ে উঠেছে।[২৩]

বাংলায় হিন্দু ধর্মকে কেন্দ্র করে বহু মতবাদ বা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ভক্তিবাদ, ভাববাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ, ভেদপ্রথা, সতীদাহ প্রথা ও শিখ ধর্ম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গুরু নানক শিখ ধর্মের প্রবর্তক। ভক্তি ভাবনায় মধ্যযুগের তিন প্রধান ব্যক্তি হলেন- উত্তরে বল্লভাচার্য, বাংলায় শ্রীচৈতন্য এবং আসামে শঙ্কুরদেব।[২৪]

ভক্তিবাদ আন্দোলনকে যিনি প্রাধান্যতায় আনয়ন করেন, তিনি হলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত রামানুজ, যিনি খুব সম্ভবত ১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন।[২৫] যে সব ভক্তিবাদী সাধকগণ প্রচলিত ধর্ম ব্যবস্থার বিরোধিতা, মূর্তিপূজা ও বর্ণাশ্রমের সমালোচনা করে ভক্তিবাদের বাণী প্রচার করতেন তাদের মধ্যে কবীর ও নানক অন্যতম।[২৬]

নদীয়ায় জন্মগ্রহণের পর মাত্র বাইশ বছর বয়সে গয়াধামে ভ্রমণ করতে এসে চৈতন্য দেবের মনে কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধে ভক্তিভাবের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে।[২৭]

তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। অজন্তার গোহা-মন্দির গুলো বানিয়েছিলেন বৌদ্ধরা কিন্তু ইলোরায় বৌদ্ধ গুহা মন্দিরের পাশাপাশি হিন্দ ও জৈন মন্দিরও পাওয়া যায়।[২৮] উড়িষ্যার কোনারকে (১২৩৪ থেকে ১২৬৪ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত) মন্দিরের ভিত্তি গাত্র নিচে থেকে-

---

২২. সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯

২৩. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫

২৪. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮

২৫. ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪

২৬. সতীশ চন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫

২৭. সতীশ চন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭

২৮. আবদুস সালাম মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৬

ছাদ পর্যন্ত এমন সুক্ষ্ম ও জটিল ভাস্কর্য শিল্পের অলঙ্কারে মণ্ডিত যে মন্দির গাত্রের প্রতিটি পাথর একেক টুকরো রত্নালঙ্কারের মত অপূর্ব কারুকার্যময় ।[২৯] মধ্যযুগে বাংলার হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল দোলযাত্রা, রথযাত্রা, হোলি, জন্মাষ্টমী, দূর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, লক্ষ্মীপূজা, গণেশ পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, নামযজ্ঞ, দীপাবলী, সংক্রান্তি, রাখীবন্ধন, ভাইফোটা ও গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি। হিন্দুদের মধ্যে তাদের ধর্মীয় উৎসব পালা পার্বণও ছিল।[৩০] এ যুগের সর্বাধিক জনপ্রিয় উৎসব ছিল বসন্ত পঞ্চমী, হোলি, দীপাবলী, শিবরাত্রি।[৩১] হোলি বলতে গেলে শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসব।[৩২] সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব দূর্গাপূজা-বাঙালি হিন্দুদের পাশাপাশি বাংলাদেশের আরও বেশ কিছু ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠির মানুষও পালন করে থাকেন।[৩৩]

---

২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৬

৩০. আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস মুসলমান আমল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

৩১. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯

৩২. আব্বাস আলী খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১

৩৩. বিবিসি বাংলা, ঢাকা, ৫ই অক্টোবর ২০২২

ঘ. বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

দশম শতাব্দির শেষ ভাগে এবং একাদশ শতাব্দির শুরুতে তুর্কি বংশোদ্ভুত গজনীর সুলতান মাহমুদ উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভারত আক্রমণ করেন। সুলতান মাহমুদ ধর্মীয় উন্মাদনা থেকেই যে ভারতে অভিযান পরিচালনা করেছেন এ তথ্য প্রথম প্রচার করেন ঐতিহাসিক উতবী- তাঁর *তারিখ-ই-ইয়ামিন* গ্রন্থে।[১] কেউ কেউ মাহমুদের অভিযানকে ধন সম্পদ লুণ্ঠন করাই বলে অভিহিত করেছেন। ভারতে সুলতান মাহমুদের অভিযান পরিচালনার সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে স্যার হ্যান্ডি ইলিয়ট তার History of India as told by its own Historians (Vol-2) গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ ১৭ টি অভিযানের কথা উল্লেখ করেছেন।[২] তিনি রাজা জয়পাল, মুলতানের মুসলিম শাসনকর্তা আবুল ফাতাহ দাউদ, জয়পালের দৌহিত্র সুখপাল, কাশ্মিরের দুর্ধর্ষ খোক্কার উপজাতি গোষ্ঠি, আনন্দপালের সম্মিলিত বাহিনী, আনন্দপালের পুত্র ত্রিলোচনপাল, কনৌজের প্রতিহার রাজ রাজ্যপাল, চান্দেল্লরাজ বিদ্যাধর ও গুজরাটের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির, মুলতানের জাঠ ও সিন্ধু নদীর ভাটিগণ প্রমূখ রাজা ও শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এভাবেই তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন রাজ্য জয় করেন। তাঁর অভিযান ও রাজ্য জয়ের মধ্য দিয়েই ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন ও রাজনীতির গোঁড়াপত্তন হয়। অতএব দেখা যায় গজনভীগণ যদিও কোন ভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন নি বা সুদৃঢ় করেন নি, কিন্তু পরবর্তীকালে এরা ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের পুণর্গঠনে প্রভূত সাহায্য করে।[৩] ভারত উপমহাদেশের মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরি। মুহাম্মদ ঘুরি ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দে গজনীর মসনদে আরোহণ করার পর ভারতে রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি মুলতান, পাঞ্জাব, চন্দ্রভার, গোয়ালিয়র, কনৌজ, কালিঞ্জর, আনহিলওয়ার প্রভৃতি করায়ত্ব-

তথ্যসূত্রঃ

---

১. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

৩. ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

করে অবশেষে দিল্লী দখল করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন।[৪] তিনি বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় তিনি বিভিন্ন গোষ্ঠি বিশেষত রাজপুতদের বাধার সম্মুখীন হয়। প্রথম অভিযান তিনি উচ্চ এর ভাটি রাজপুতদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন। তাঁর সময়ের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হলো তরাইনের যুদ্ধ। ১১৯১ সালে থানেশ্বরের তরাইনে পৃথ্বিরাজের সাথে যুদ্ধ হলে তিনি পরাজিত হন। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে তরাইনে সংঘটিত যুদ্ধে রাজপুতদের সম্মিলিত বাহিনীর হাতে ঘুরি পরাজিত হন।[৫] পরাজয়ের গ্লানি ও অপমান মুছে দিতে তিনি পুনরায় তরাইনের ২য় যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। *মিনহাজ-ই-সিরাজের* বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মুহাম্মদ ঘুরি ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে পৃথ্বিরাজের মুখোমুখি হয়েছিলেন।[৬] শেষ পর্যন্ত ১২০০০ অশ্বারোহী নিয়ে মুহাম্মদ ঘুরি বেপরোয়া ভাবে আক্রমণ করেন এবং সমগ্র হিন্দু শিবিরে মৃত্যু ও ধ্বংসলীলা বহন করেন।[৭] সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিরামহীন যুদ্ধ চলে। পৃথ্বিরাজ পরাজিত হন এবং পলায়ন করেন। মুহাম্মদ ঘুরি তাঁর প্রদেশ গুলোতে নিজস্ব প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করে শাসন কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গজনীতে তাজুদ্দিন ইলদিজ, ভারতে কুতুবউদ্দিন আইবেক এবং সিন্ধুতে নাসিরউদ্দিন কুবাচা প্রমূখ। তিনি ভারতে একটি মুসলিম আধিপত্যবাদী শাসন ও রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালান। ভারতের ঘুণে ধরা রাজনৈতিক কাঠামো তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝতে সক্ষম হন এবং একটি চিরস্থায়ী প্রভুত্ব স্থাপন করতে মনস্থ করেন।[৮] ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি 'দেমইয়াহ্' নামক স্থানে ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এভাবে দ্বাদশ শতাব্দির শেষের দিকে ভারতের উত্তরাঞ্চলে একটি মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯] এসময় থেকে একদিকে কুতুবউদ্দিন আইবেক উত্তর ভারতে, অপরদিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

---

[৪] ড. মো: শফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

[৫] এ কে এম শাহনাওয়াজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

[৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

[৭] ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

[৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

[৯] ড. মো: শফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

৫৮৮ হিজরীতে মুহাম্মদ ঘুরী তাঁর দুশমন হিন্দুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার পর বিজিত রাজ্য রক্ষার্থে যে ফৌজ নিয়োজিত রেখে যান, আইবেককে তাঁর সিপাহ্ সালারের পদ প্রদান করেন।[১০] ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর আইবেক নিজেকে দিল্লীর সুলতান হিসেবে ঘোষণা প্রদান করেন এবং যথারীতি ঘুরির অন্যান্য শাসনকর্তাদের স্বীকৃতি লাভ করেন। আইবেক তাঁর রাজত্বকালে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

প্রথমে উনি (আইবেক) সিরোহী দখল করেন ও পরে মুদাব্বিরের মতানুসারে ১১৯৯-১২০০ খ্রিস্টাব্দে মালব আক্রমণ করেন।[১১] ৫৮৯ হিজরীতে গুজরাটের নেহরওয়ালার রাজার সেনাপতি জীবন রায়কে পরাভূত করেন। একের পর এক দীল্লি, গোয়ালিয়র, বিয়ানা ও অন্যান্য স্থান সমূহ কুতুবউদ্দিন আইবেক কর্তৃক অধিকৃত হয়। এভাবে দিল্লীর সম্রাট কুতুবউদ্দিন আইবেক ভারতে রাজনৈতিক প্রতিষ্টা লাভ করেন। কুতুবউদ্দিন আইবেক, ফিরোজ শাহ তুঘলক, সুলতান ইলতুৎমিশ, সুলতানা রাজিয়া, বাহরাম শাহ, মাসুদ শাহ, নাসিরউদ্দিন মাহমুদ, গিয়াসুদ্দিন বলবন ও কায়কোবাদ প্রমূখ ছিলেন তুর্কি বংশের উল্লেখযোগ্য শাসক। অপরদিকে বাংলায় মুসলমানদের আগমন দূর অতীতের কোন এক শুভক্ষণে হয়ে থাকলেও তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিষ্টা লাভ হয়েছিল হিজরী ৬০০ সালে অর্থাৎ ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে।[১২] তৎকালীন ভারত সম্রাট কুতুবউদ্দিন আইবেকের সময়ে বখতিয়ার খলজী বলতে গেলে আলৌকিক ভাবে বাংলায় তাঁর রাজনৈতিক প্রতিষ্টা লাভ করেন। বখতিয়ার খলজী প্রথমে বিহার, পরে মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নদীয়া জয় করেন। বখতিয়ার খলজী বিহার অভিযানের মধ্য দিয়ে বাংলায় আসার পথ পেয়ে যান। মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বাংলা বিজয়ের ফলে এদেশে মুসলমানদের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়।[১৩] স্বাধীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

---

১০. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (অনুদিত), মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশতা বিরচিত- *ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস*, ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ২০২১, পৃ. ১৪৯

১১. অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

১২. আব্বাস আলী খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

১৩৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলা সম্পুর্নরূপে দিল্লীর তুঘলক সাম্রাজ্যভুক্ত প্রদেশ ছিল। দিল্লী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, অশান্তি, বাংলার উপর সুলতানগণের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেলে তৎকালীন সোনারগাঁও প্রদেশের শাসনকর্তা ফখরা শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে শুরু করে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের উচ্ছেদ পর্যন্ত পুরোপুরি দু'শো বছর বাংলাদেশ যেরকম অবিচ্ছিন্নভাবে স্বাধীনতা ভোগ করেছিল, তত দীর্ঘদিন ধরে আর কোন সময় তার স্বাধীনতা স্থায়ী হয়নি।[১৪] শেষ পর্যন্ত ১৩৩৮ সালে বাহরাম খানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ফখরুদ্দিন সাতগাঁওয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ উপাধি ধারণ করেন।[১৫] সুলতান ফখরুদ্দিন ২ বৎসর ৫ মাস রাজত্ব করেন।[১৬] বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন যথাক্রমে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ, আলাউদ্দিন আলী শাহ, শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ, সুলতান সেকান্দর শাহ, সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ, সায়ফ উদ্দিন হামজা শাহ, জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহ, নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ, রুকনুদ্দিন বারবক শাহ, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, নাসির উদ্দিন নসরৎ শাহ, আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ এবং গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ প্রমূখ। হুসেন শাহ তাঁর রাজ্য উত্তরে আসাম, দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-পূর্বে চট্টগ্রাম ও আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন।[১৭] এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার পাঁচ শতকের মুসলিম শাসনের মধ্যে কয়েক বছরের জন্য রাজা গণেশ হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ফার্সি ভাষায় লিখিত ইতিহাসে তারঁ নাম 'কান্‌স্‌' বলা হয়েছে। 'কান্‌স্‌' প্রকৃত পক্ষে 'কংস' অথবা গণেশ ছিল।[১৮] রাজা গণেশের আধিপত্যের সময়ে বাংলা রাজ্যের সীমানা অক্ষুন্ন থাকে এবং পাণ্ডুয়াতেই রাজধানী ও প্রধান শাসন কেন্দ্র অবস্থিত ছিল।[১৯]

---

[১৪] সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

[১৫] ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩

[১৬] শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত* পৃ. ৮১

[১৭] সতীশ চন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯

[১৮] আব্বাস আলী খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

[১৯] সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

'রিয়াজ'- এর মতে গৌড়ে খাদ্যাভাব দেখা দেয়ার ফলে আফগানরা গৌড়ের দুর্গ জয় করতে পেরেছিলেন; গৌড় দখলের পর শের খাঁর পুত্র জালাল খাঁ গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের পুত্রদের বন্দি করলেন; মাহমুদ শাহ নিজে পালিয়ে গেলেন; শের খাঁ তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করলেন; মাহমুদ তখন উপায়ান্তর না দেখে শের খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন এবং সেই যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হলেন।[২০] এইভাবে বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতানের জীবনাবসান ঘটল। তাঁর রাজত্ব পাঁচ বৎসর স্থায়ী ছিল।[২১]

বাংলায় মুসলিম সমাজ গঠনে ও উন্নয়নে এমনকি সুলতানি বাংলার রাজনীতিতে সুফি-সাধক ও দরবেশদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বাংলায় আগত এসব সুফি সাধক শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এই পীর বংশীয়রা কেবল ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নয়, সমসাময়িক রাজনীতি ও প্রশাসন ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন।[২২] সুফি সাধকরা সুলতানদের কাছে গভীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সুফিরা বিভিন্ন বিষয়ে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সুলতানদের আস্থা ও ভক্তি অর্জন করেছিলেন। সুলতানি আমলের উল্লেখযোগ্য সুফি সাধকরা ছিলেন- জালালুদ্দিন তাব্রিজি, আলা-অল-হক, শেখ-উল-ইসলাম, নুর কুতুব-উল-আলম, শাহ্ ইসমাইল গাজী, মুজঃফর শামস্ বল্খি ও আশরাফ জাহাঙ্গীর সিম্নানী। সুলতান ফখরুদ্দীনের ফকিরদের প্রতি শ্রদ্ধা এত প্রগাঢ় ছিল যে তিনি তাদের (ফকিরদের) মধ্য থেকে শায়দা নামে একজনকে 'সোদকাওয়াঙে' তাঁর নায়েব (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করেছিলেন।[২৩] বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে, "The most holy man at his (Giasuddin Ajam) court was Mukdum Shah Nur Kotub Alum, son of Alalhuk". [২৪] সুলতান গিয়াসুদ্দিন আযম শাহ্ এর রাজত্বকালে নুর কুতুব আলমের নেতৃত্বে রাজনীতি ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে উলেমা সম্প্রদায়ের প্রভাব সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে।[২৫]

---

[২০] শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৯

[২১] শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, ১০৭

[২২] সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১

[২৩] সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

[২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

[২৫] সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২

সমগ্র সুলতানী আমলে বাংলা রাজ্য বহু রাজনৈতিক শ্রেণি ও উপ-শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। এই সময়ে বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক বিভাগকে *ইকতা* এবং ইকতার শাসনকর্তাকে *মুকতা* বলা হত।[২৬] বখতিয়ার তাঁর অধিকৃত এলাকাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে *ইকতা* প্রথা চালু করেন।[২৭] ঐতিহাসিক মিনহাজ এর মতে বখতিয়ার খলজি তাঁর বিজিত রাজ্যকে তিনটি ইকতায় বিভক্ত করেন।[২৮] *ইকতা*র প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বলা হতো *মুকতা*। মুইজ-উদ-দীন তুগরলকে হত্যা করে বলবন স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে লখনৌতির গভর্ণর নিযুক্ত করেন এবং বলবন নিজে লখনৌতির অন্যান্য *ইকতায় মুকতা* নিযুক্ত করেন।[২৯] সিপাহ সালার হিজবরদ্দিন হাসান আদিব, বদাউনের *মুকতা* ছিলেন।[৩০]

বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলে বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy) ছিল অত্যন্ত কৌশলী। সুলতানেরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রে দূত (Ambassador) আদান-প্রদান করতো। সুলতান কর্তৃক মনোনিত প্রতিনিধির মাধ্যমে সুলতানেরা বহির্বিশ্বের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়েছিলেন। সুলতানেরা দূত মারফত অন্য রাজ্যের রাষ্ট্র প্রধানের জন্য উপঢৌকন পাঠাতেন। আজম শাহ চীনের সম্রাটের সঙ্গেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন।[৩১] চৈনিক সম্রাট অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁর দূতকে সভায় গ্রহণ করেন এবং ১৪০৯ খ্রিস্টাব্দে আজম শাহের রাজসভায় চৈনিক দূত প্রেরণ করেন।[৩২] সুলতান সাইফুদ্দিনও চীনা সম্রাটকে পত্র লিখেন। এভাবে সুলতানেরা বহির্দেশের সাথে সুসম্পর্ক তৈরী করে বৈদেশিক বাণিজ্যের বিকাশে উন্নতি সাধন করেন। এমনকি একটি সমৃদ্ধ রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এভাবেই বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো।

---

[২৬] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানি আমল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

[২৭] অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭

[২৮] সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬

[২৯] আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৪

[৩০] অনিরুদ্ধ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

[৩১] সতীশ চন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭

[৩২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলার বিচার প্রশাসন

ক. বাংলার প্রশাসনিক কাঠামো বা বিন্যাস

খ. বিচার ব্যবস্থার গঠন

গ. বাংলার বিচারিক আদালতের শ্রেণিবিন্যাস

ক. বাংলার প্রশাসনিক কাঠামো বা বিন্যাস

বাংলার স্বাধীন সালতানাতের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা একনায়কতান্ত্রিক ছিল। সুলতান ছিলেন রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস। তিনি শুধু সর্বোচ্চ প্রশাসক ছিলেন না, শাসন বিভাগের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি ও অপসারণ করতেন। প্রশাসনের সকল দপ্তরের তিনিই প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। সুলতানদের জারিকৃত মুদ্রার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, সুলতান স্বাধীন এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বাংলার প্রশাসনিক কাঠামো মূলত দিল্লী সালতানাতের আদলে গঠিত হয়েছিল। বাংলা দিল্লীর প্রদেশ হিসেবে শাসিত হয়। Under Delhi Sultanate Bengal was ruled by governor called Wali or Iqtadar or Mukta.[১] যেহেতু বাংলা পূর্বে দিল্লীর প্রদেশ হিসেবে শাসিত হয়েছে সেহেতু বাংলা স্বাধীন হলেও প্রশাসনিক কাঠামোর তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি। এক্ষেত্রে দিল্লীর সুলতানের ক্ষমতা ও প্রশাসনিক স্তরের অনুরূপ ক্ষমতা বাংলার স্বাধীন সুলতানগণও প্রয়োগ করতেন। Thus the supreme human agency in the empire of Delhi for enforcing and interpreting the law was the Sultan.[২] In Mediaeval India the Sultan, being head of the state, was the supreme authority to administer justice in his kingdom.[৩]

তথ্যসূত্রঃ

---

১. Md. Mosharraf Hossain Bhuiyan, *Administration: Sultanate and Mughal, History of Bangladesh, Sultanate and Mughal Periods, (c.1200-1800 CE), Vol.-1, Political History, Chapter-19*, Edited by Abdul Momin Chowdhury, Dhaka, Asiatc Society of Bangladesh, P.

২. Ishtiaq Hosain Qureshi, *The Administration of the Sultanate of Delhi*, Delhi, Oriental Books Reprint Corporation, 1971, P. 43

৩. B.M. Gandhi, *V.D. Kulshreshtha's Landmarks in Indian Legal and Constitutional History,* Lucknow, Eastern Book Company, 2009, P. 2

বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসনামলে রাজধানী থেকে গ্রাম পর্যন্ত প্রশাসনিক কাঠামো বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। সমগ্র সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশ বা সুবায়, সুবা গুলো জেলায়, জেলাগুলো পরগনায় এবং প্রতিটি পরগনা কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত ছিল। স্বাধীন সুলতানি যুগে পরগনা ছিল নিম্নতম প্রশাসনিক একক। মুদ্রা ও শিলালিপি হতে বাংলার সুলতানি আমলের প্রশাসনিক বিভাগ ও স্থানীয় শাসন সম্পর্কে জানা যায়। মুদ্রায় ইক্‌লীম, আরছা, শহর, কসবা ও খিত্তা নামক প্রশাসনিক বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪]

তাদের আমলে রাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগ গুলি 'ইক্তার' বদলে 'ইক্‌লীম' নামে অভিহিত হতে লাগল, 'ইক্‌লীম' এর উপবিভাগ গুলি 'আরসাহ্' নামে অভিহিত হল।[৫] বাংলার কেন্দ্রীয় প্রশাসন পরিচালনার জন্য সুলতানকে একটি মন্ত্রিপরিষদ সহযোগিতা করত। একেক সুলতানের-সময় ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার মন্ত্রী পরিষদ ছিল। মামলুক শাসনামলে ০৪ (চারটি) মন্ত্রী পদের সংখ্যা পাওয়া যায়। যাইহোক, একইভাবে বাংলার সালতানাতের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কার্যক্রম চারটি দপ্তরের উপর ন্যস্ত ছিল। কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা দপ্তর গুলো হলো-

ক) *দিওয়ান-ই-উযারাত* (উযীরের মন্ত্রণালয়),
খ) *দিওয়ান-ই-রিসালাত ও দিওয়ান-ই-কাযা* (ধর্ম ও বিচার সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়),
গ) *দিওয়ান-ই-আরয* (সামরিক মন্ত্রণালয়) এবং
ঘ) *দিওয়ান-ই-ইনশা* (পত্র বিনিময় মন্ত্রণালয়)।

দীওয়ান-ই-উযারাতঃ

মূলত এটা হল অর্থ বিভাগ। এই দপ্তরের কর্তা ব্যক্তিকে 'ওয়াজির' বলা হয়। The head of the civil administration was the wazir; his special domain was financial organization and administration.[৬]

---

[৪] ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭

[৫] সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০০

[৬] Ishtiaq Hosain Qureshi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

সুলতান প্রদত্ত প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন ওয়াজির। প্রধানমন্ত্রীকেই ওয়াজির বলা হতো। তাঁকে নায়েবে ওয়াজির সহ অন্যান্য কর্মচারীরা সহযোগিতা করত। সালতানাতের ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়, বেসামরিক কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধান, করারোপের নিয়ম তৈরি ও রাজস্ব নির্ধারণ করা ইত্যাদি কাজ পরিচালনা করা এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিল।

দিওয়ান-ই-রিসালাত ও দিওয়ান-ই-কাযাঃ

দিওয়ান-ই-রিসালাত ও *দিওয়ান-ই-কাযা* একই দপ্তরের দুটি শাখা ছিল। ধর্মীয় ও বিচার প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করা হতো এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে। এই মন্ত্রণালয়ের প্রধানকে ***সদর-উস-সুদুর*** বলা হতো।

প্রধান কাজী বা *দিওয়ান-ই-কাযা* বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন। ধর্মীয় বিষয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা, জ্ঞানীগুণী ও ধার্মিকদের মধ্যে বৃত্তি বিতরণ, মসজিদের ইমাম ও ধর্ম প্রচারক নিয়োগ এবং রাষ্ট্রের বিচার ও আইন সংক্রান্ত বিষয় তত্ত্বাবধান করা এই মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ ছিল। ড. আইএইচ কোরেশীর মতে- "এই মন্ত্রী ধর্মীয় দপ্তরের দায়িত্ব পালন করতেন এবং পণ্ডিত ও ধার্মিক ব্যক্তিদের বৃত্তি প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[৭] সুলতানকে বিচারকার্যে সাহায্য করা, আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁকে উপদেশ দেয়া, প্রাদেশিক বিচারকের কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করা, জটিল দেওয়ানী ও ফৌজদারী অপরাধের বিচার করা এবং ইসলামী আইন-কানুন রাষ্ট্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা তাঁর কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল।[৮]

দীওয়ান-ই-আরজঃ

এটা সামরিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয়ের প্রধানকে *আরজ-ই-মুমালিক* বলা হতো। তিনি সামরিক বাহিনীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলেন। সৈন্য নিয়োগ, সৈন্য বাহিনী পরিদর্শন করা, সৈনিকদের পদোন্নতি-পদচ্যুতি, সামরিক অভিযানে সৈনিক নির্বাচন করা, সৈনিকদের পরিবহন, ঘোড়া ও রসদ সরবরাহ ও তত্ত্বাবধান করা এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল।

---

৭. এ. কে. এম শাহনাওয়াজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭

৮. ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান ও অন্যান্য, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, রাজশাহী, বুকস প্যাভিলিয়ন, ২০০১, পৃ. ২৬০

সৈন্য নিয়োগ, সৈন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, সৈন্যদের বেতন ও ভাতা স্থির করা এবং সামরিক অফিসারদের জন্য জায়গীর প্রদানের সুপারিশ করা *আরয-ই-মুমালিকে*র কর্তব্যের অর্ন্তভূক্ত ছিল।[৯] *আরিজ-ই-মুমালিক* সৈন্য বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ সহ সামরিক বিষয়ের সমগ্র শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।[১০]

দিওয়ান-ই-ইনশাঃ

এই দপ্তরটি রাজকীয় পত্র বিনিময়ের দায়িত্ব পালন করত। এই দপ্তরের সভাপতিকে *দবির-ই-খাস* বলা হতো। রাষ্ট্রের গোপন তথ্যের সংরক্ষণ, বিদেশী শাসকদের নিকট সুলতানের চিঠিপত্র প্রেরণ ও সুলতানের আদেশ-নির্দেশ ও ফরমান লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি অত্র মন্ত্রণালয়ের কর্তব্য ছিল। ইহাকে যথার্থভাবে বলা হয় যে, ইহা ছিল রাষ্ট্রের তথ্যের সংরক্ষণাগার। রাজকীয় ফরমান গুলোর মুসাবিদার দায়িত্ব ছিল *দিওয়ান-ই-ইনশা*র উপর।

কেন্দ্রীয় শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আরো কতকগুলি পৃথক পৃথক সরকারী বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন- *দিওয়ান-ই-বন্দেগান* বা ক্রীতদাস বিভাগ, *দিওয়ান-ই-আমীর* কোহি বা কৃষি বিভাগ, *দিওয়ান-ই-মুস্তাখারাজ* বা অনাদায়ী রাজস্ব বিভাগ, *দিওয়ান-ই-খায়রাত* বা সরকারি সাহায্য বিতরণ বিভাগ, *দিওয়ান-ই-ইসতিকাক* বা সরকারি ভাতা বিভাগ, *দিওয়ান-ই-ইমারাত* বা সৌধ নির্মাণ বিভাগ ইত্যাদি।[১১]

বাংলার কেন্দ্রীয় প্রশাসন বিভাগে কর্মরত অমাত্যবর্গ, উজির, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বিভাগ, সামরিক বিভাগ, বিচার বিভাগ ও প্রাদেশিক বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের সহযোগিতায় সুলতান প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। উপরোক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনিক দপ্তরের কর্মকর্তাগণ ব্যতীত কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় নিযুক্ত অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে *ওয়াকিল-ই-দার*, *আমীর-ই-হাজীব*, *নকীব-উল-নুকাবা-*

---

৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯

১০. এ. কে. এম আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪, পৃ. ৩৯

১১. এ. কে. এম আবদুল আলীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

আমীর-ই-মজলিস, *আমীর-ই-শিকার*, *আমীর-ই-দাদ*, *নাইব-উল-মূলক* ও *নাইব-উল-গায়েবাত* প্রধান ছিলেন।[১২] সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারি সুলতানই নিয়োগ করতেন। কর্মকর্তাগণ তাদের কার্যাবলির জন্য সুলতানের নিকট দায়ী থাকতেন। প্রকৃতপক্ষে তারা সুলতানের আজ্ঞাবহ ভৃত্য ছিলেন।

কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন দিক আলোচনা করবার পর ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রীতির দিক হতে বাংলা ছিল একটি রাজতান্ত্রিক, বংশগত ও মনোনীত নেতৃত্বের শাসন সমন্বয়ে শাসিত যথেচ্ছাচারী আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা।

---

[১২] ড. মুহাম্মদ আসগর আলী খান ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬২

খ. বিচার ব্যবস্থার গঠন

বাংলার সুলতানগণ সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনে অত্যন্ত দায়িত্বশীল ছিলেন। সুলতান ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করতেন। রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে বিচার প্রশাসনের কার্যক্রম পরিচালনা করা সুলতানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। তিনি ছিলেন ধর্ম বিশ্বাসীদের রক্ষাকর্তা ও প্রজাবৃন্দের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদের বিচারক অর্থাৎ মধ্যস্থতার দ্বারা তাদের বিবাদ মীমাংসাকারী; তিনি ছিলেন আমলাতন্ত্র প্রধান; তিনি ছিলেন সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।[১]

সুলতান প্রধান আইন বলবৎকারী ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার নীতি গ্রহণ করে বিচার বিভাগ গঠন করেন। সুলতানকে কোনো কোনো মুদ্রায় *সুলতান-উল-আদিল* (ন্যায়পরায়ণ রাজা) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[২]

সুলতান রাষ্ট্রের প্রজাসাধারণের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি স্বচ্ছ বিচার বিভাগ গঠন করেন। এই বিভাগের তিনি নিজেই প্রধান কর্তা ব্যক্তি ছিলেন। সুলতান নিজেই সর্বোচ্চ বিচারপতি ছিলেন, কোনো কোনো সময় সুলতান নিজে বিচার করতেন, আবার কোনো কোনো সময় তিনি *আমীর-ই-দাদ* বা কাজীর মাধ্যমে বিচার করতেন।[৩] সুলতান ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারপতি ও জনগণের শেষ আশ্রয়স্থল। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার মূল চাবিকাটি।

জানা যায় বাংলার সুলতানী শাসনামলে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সুলতানগণ দিল্লী সালতানাতের অনুরূপ চারটি প্রধান মন্ত্রণালয় গঠন করেন। তন্মধ্যে বিচার ও আইন মন্ত্রণালয় ছিল অন্যতম। বিচার বিভাগ *দিওয়ান-ই-রিসালাত ও দিওয়ান-ই-কাযা* (ধর্ম ও বিচার সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়) এর অধীন ছিল।

তথ্যসূত্রঃ

---

১. এ. কে. এম আবদুল আলীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

২. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৫

৩. আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস*, *মুসলমান আমল*, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০২০, পৃ. ১৩৫

দিওয়ান-ই-রিসালাত ও *দিওয়ান-ই-কাযা* অর্থাৎ একই দপ্তরের দুটি শাখা ছিল।[৪] ধর্ম ও বিচার মন্ত্রণালয়ের প্রধানকে *সদর-উস-সুদুর* বলা হয়।

সদর-উস-সুদুর একই সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি *কাজী-ই-মুমালিক* এর দায়িত্বও পালন করতেন।[৫] প্রধান বিচারপতির আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে।[৬]

সুলতান একটি নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ গঠন করার লক্ষে তাঁর রাজ্যের রাজধানী থেকে গ্রাম পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) স্তরের আদালত গঠন করেন। কেন্দ্রীয় রাজধানীর আদালত, প্রাদেশিক আদালত, জেলা বা সরকার আদালত, পরগণার আদালত ও গ্রাম আদালত সমূহ গঠন করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেন। পুরো বিচার বিভাগকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুই ভাগে বিভক্ত করেন। ফৌজদারী আপীলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আপীল আদালত ছিল *দিওয়ান-ই-মাজালিম*।[৭] দেওয়ানী মামলার আপীলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আপীল আদালত ছিল *দিওয়ান-ই-রিসালাত*।[৮]

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতের *কাজী*সহ অপরাপর আদালতের বিচারক ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হতো। সুলতান প্রয়োজনীয় সংখ্যক *কাজী* ও বিচার বিভাগীয় কর্মচারী নিয়োগ দিতেন। এক্ষেত্রে সুলতান একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন আইন প্রণয়নকারী, শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বক্ষমতার অধিকারী, বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ অধিকর্তা এবং তিনিই উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ করতেন।[৯]

The Muslim jurists assign the following functions to the Sultan: to appoint officers to help him in his public and legal duties.[১০]

---

৪. এ. কে. এম আবদুল আলীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

৫. ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬০

৬. আবদুস সালাম মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৪

৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৪

৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৪

৯. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২

১০. Ishtiaq Hosain Qureshi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

উজির হতে শুরু করে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সব কর্মকর্তাদেরকে সুলতানই নিয়োগ করতেন এবং তাদের কার্যাবলির জন্য সুলতানের নিকটই দায়ী থাকতেন।[১১]

রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা, অপরাধ দমন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলে বিচার বিভাগ একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর গড়ে উঠে। স্বতন্ত্র বিচার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক শাখায় সর্বোচ্চ সুলতানের আদালত, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে বাংলার বিচার ব্যবস্থা গঠন করা হয়।

---

[১১] ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৫

গ. বাংলার বিচারিক আদালতের শ্রেণিবিন্যাস

মুসলিম শাসন কাঠামোর অন্যতম দিক ছিল সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। বাংলার সুলতানগণ নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনকে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রধান কর্তব্য এমনকি ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। বাংলার বিচার ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত হয়ে গড়ে উঠেছিল। আদালত গুলো একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণি বিভাগ সহ বিভিন্ন ধাপে- রাজধানী, প্রদেশ, জেলা, পরগনা এবং গ্রামে গড়ে উঠেছিল। A systematic classification and gradation of the courts existed at the seat of the capital, in provinces, districts, parganas and villages.[১] বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলে মূলত পাঁচ শ্রেণির আদালত বিদ্যমান ছিল। যা নিম্নরূপঃ

১। কেন্দ্রীয় রাজধানীর আদালত

২। প্রাদেশিক আদালত

৩। জেলা বা সরকার আদালত

৪। পরগনার আদালত এবং

৫। গ্রাম আদালত।

উপরে বর্ণিত প্রতিটি স্তরের আদালত সমূহ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি আদালতের ক্ষমতা ও এখতিয়ার ভিন্ন ভিন্ন ছিল। নিম্নে প্রতিটি প্রশাসনিক এলাকার আদালত সমূহের শ্রেণিবিন্যাস তুলে ধরা হলোঃ-

১। কেন্দ্রীয় রাজধানীর আদালতঃ

সালতানাতের কেন্দ্রীয় রাজধানীর আদালত সমূহকে ছয় শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। Six courts which were established at the capital of the Sultanate.[২]

তথ্যসূত্রঃ

---

১. B.M. Gandhi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

নিম্নে ছয় শ্রেণির কেন্দ্রীয় রাজধানীর আদালত সমূহ উল্লেখ করা হলো। যথাঃ-

ক) মহামান্য রাজার আদালত

খ) *দেওয়ান-ই-মজলিশ*

গ) *দেওয়ান-ই-রিসালাত*

ঘ) *সদর-ই-জাহানে*র আদালত

ঙ) প্রধান বিচারপতির আদালত এবং

চ) *দেওয়ান-ই-সিয়াসত*।

২। প্রাদেশিক আদালতঃ

স্বাধীন সুলতানি আমলে প্রদেশ বা সুবার কেন্দ্রীয় দপ্তরে বিচারিক আদালত ছিল। এসব আদালত গুলো প্রদেশে সৃষ্ট বিরোধ মিমাংসায় এখতিয়ার ভিত্তিক বিচারিক দায়িত্ব পালন করতো। *সুবা* নামে পরিচিত প্রত্যেকটি প্রদেশে ০৫ (পাঁচ) টি আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল। আদালত সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো। যথা- *আদালত- নাজিম-ই-সুবা*, *আদালত- কাজী-ই-সুবা*, *নাজিম-ই-সুবার* অধিবেশন বা সার্কিট, *দেওয়ান-ই-সুবা* ও *আদালত- সদর-ই-সুবা*"।[৩] প্রাদেশিক আদালত সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ-

ক) *নাজিম-ই-সুবা*র আদালত

খ) *কাজী-ই-সুবা*র আদালত

গ) গভর্নরের বেঞ্চ বা সার্কিট

ঘ) *দেওয়ান-ই-সুবা*র আাদালত এবং

ঙ) *সদর-ই-সুবা*র আদালত।

---

[৩] আবদুস সালাম মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৫

০৩। জেলা বা সরকার আদালতঃ

জেলাগুলি 'সরকার' নামে পরিচিত ছিল।[৪] In each district (sarkar), at the district Headquarter, six courts were established, namely: Qazi, Dadbaks or Mir Adls, Faujdars, Sadre, Amils, and Kotwals.[৫] জেলার আদালত সমূহ পৃথক পৃথক এখতিয়ারাধীন দেওয়ানী ও ফৌজদারী প্রকৃতির অপরাধের বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। প্রতিটি জেলা সদরে ছয় ধরনের আদালত বিচারিক কাজ করতেন। যথাঃ

ক) জেলা কাজীর আদালত

খ) দাদবেক বা মীর আদিলের আদালত

গ) ফৌজদারের আদালত

ঘ) সদরের আদালত

ঙ) আমিলের আদালত এবং

চ) কোতোয়ালের আদালত।

৪। পরগণার আদালতঃ

প্রতিটি পরগণা সদরে *কাজী-ই-পরগণা* নামে কাজীর আদালত ছিল।[৬] পরগণায় মূলত দুই শ্রেণির আদালত ছিল। যা নিম্নরূপঃ

ক) *কাজী-ই-পরগণা*র আদালত এবং

খ) *কোতোয়ালে*র আদালত।

৫। গ্রাম আদালতঃ

প্রতিটি গ্রামে একটি গ্রাম পরিষদ বা পঞ্চায়েত ছিল। কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে উঠেছিল। পঞ্চায়েতের প্রধান 'সারপাঞ্চ' নামে পরিচিত ছিলেন।[৭]

For each group of villages there was a village assembly or panchayat, a

---

[৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৬

[৫] B.M. Gandhi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

[৬] আবদুস সালাম মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৬

[৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৭

body of five leading men to look after the executive and judicial affairs.[৮] গ্রাম পরিষদের সদস্যরাই গ্রাম আদালত পরিচালনা করতেন। বাংলার বিচার বিভাগ উপরোক্ত শ্রেণির আদালত গঠনের মাধ্যমে সালতানাতের দেওয়ানী ও ফৌজদারি অপরাধ সমূহ বিচার করতো।

এছাড়াও বাংলার বিচার ব্যবস্থায় মিলিটারি/সামরিক বিষয়ক মামলা সমূহের বিচার নিষ্পত্তি করার জন্য পৃথক আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সেনা বাহিনীর সদস্যদের সংখ্যা ও অবস্থান অনুপাতে এ আদালত বিচারিক কাজ পরিচালনা করতেন। সেনা বাহিনীর সদস্যদের অপরাধ, অভিযোগ ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে উক্ত আদালত বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। মূলত এটি ছিল একটি বিশেষ আদালত। এ আদালতের বিচারককে ***কাজী-ই-আসকার*** বলা হতো।[৯]

---

[৮] B.M. Gandhi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

[৯] এ. কে. এম আবদুল আউয়াল মজুমদার, *বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা এবং নিম্ন আদালতের বিচার*, ঢাকা, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, অক্টোবর ২০২১, পৃঃ ৫২

চতুর্থ অধ্যায়

আদালতের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

ক. বিচারক নিয়োগ পদ্ধতি

খ. আদালতের এখতিয়ার

গ. আদালতের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

ক. বিচারক নিয়োগ পদ্ধতি

বাংলায় সুলতানি আমলে সুলতান ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার মালিক ও রাষ্ট্রপ্রধান। রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে তিনি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক, আইন ও সামরিক বিভাগের মূখ্য ছিলেন। সুলতান বিচার প্রশাসনের প্রধান ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারক ছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন আইন প্রণয়নকারী, শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে সর্ব ক্ষমতার অধিকারী, বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ অধিকর্তা এবং তিনিই উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ করতেন।[১] সুলতান ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি, প্রধান আইন প্রণয়নকারী এবং সর্বোচ্চ আপিল কোর্ট।[২] In Mediaeval India the Sultan, being head of the state, was the supreme authority to administer justice in his kingdom.[৩] সুলতান সব ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। The Sultan or King was the fountain head of all the power.[৪] তিনি বিচার প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে নিয়োগ করতেন।[৫] তিনি বিচার বিভাগেরও কর্তা ছিলেন, বিচারকদের নিয়োগ দিতেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেই বিচার করতেন।[৬] সুলতান বিচার বিভাগের কর্ণধার হিসেবে প্রধান বিচারপতি *কাজী-উল-কুজ্জাত* এর নিয়োগ সহ প্রদেশের বিচারক (কাজী) নিয়োগও করতেন। *কাজী-উল-কুজ্জাতে*র সঙ্গে পরামর্শক্রমে সুলতান বিভিন্ন প্রদেশ ও অঞ্চলের কাজী নিয়োগ করতেন।[৭] সুলতান স্বয়ং বিভিন্ন প্রদেশের ও অঞ্চলের কাজী নিয়োগ করতেন, তবে নি:সন্দেহে *কাজী-উল-কুজ্জাত* এর সাথে পরামর্শক্রমেই করতেন।[৮]

---

[১] ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম (অন্যান্য): *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২।

[২] ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০

[৩] B.M. Gandhi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

[৪] Md. Mosharraf Hussain Bhuiyan, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

[৫] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৭

[৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৮

[৭] আবদুস সালাম মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৩।

[৮] লতিফুর রহমান (ভাষান্তর): এ.বি.এম. হবিবুল্লাহ রচিত *ভারতে মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৪, পৃ. ১৮৮।

সালতানাতের বিচার ব্যবস্থায় *কাজী* বা বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতার মাপকাঠি বিবেচনা করা হতো। বিচারক নিয়োগে দক্ষতা, আইনের পাণ্ডিত্য ও চারিত্রিক পবিত্রতার বিষয়টি সুলতান সবিশেষে মূল্যায়ন করতেন। প্রধান বিচারপতি ও প্রদেশের বিচারক নিয়োগে প্রায় একই যোগ্যতা বিবেচনা করা হতো। আইনে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত, সর্বোচ্চ গুণে গুণান্বিত, নিরপেক্ষ, সমাজে সম্মানিত ও দক্ষতার অধিকারী ব্যক্তিদের *কাজী* পদে নিয়োগ করা হতো। দুর্নীতিপরায়ণ, অযোগ্য ও সন্দেহজনক চরিত্রের অধিকারী কাউকেই বিচারক বা কাজী পদে সুলতান নিয়োগ দিতেন না। উচ্চ মানসম্পন্ন ও ধর্মীয় আইনের বিশেষজ্ঞদের সুলতান বিচারক পদে নিযুক্ত করতেন। From amongst the most virtuous of the learned men in his kingdom, the Sultan appointed the Chief Justice (Qazi-Ul-Quzat).[৯] তাঁকে (প্রধান কাজী) প্রশ্নাতীতভাবে সৎ, নিষ্পাপ, ধার্মিক এবং যৌনবিশুদ্ধতা সহ অপরাপর নৈতিক গুণাবলির অধিকারী হতে হতো।[১০] ইসলামী শাস্ত্রীয় গ্রন্থ- (*মিশকাত* এবং *হেদায়া*) অনুসারে *কাজী*কে ইসলামী শাস্ত্রজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ এবং নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।[১১] তাদেরকে বলা হতো *আফজাল-ই-রাজগর* অর্থাৎ সর্বোচ্চ জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি।[১২] ইবনে বতুতার মতে, কাজীরা তাঁদের দক্ষতা ও সঠিক রায় দানের মাধ্যমে প্রায়শই আইনের শিক্ষক হয়ে উঠতেন।[১৩] সালতানাতের বিচারক নিয়োগে সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত যোগ্যতার মান নির্ণয় করা হতো।

বিচারক নিয়োগের উল্লেখযোগ্য মানদণ্ড গুলো হলো-

"ক) Adult man- প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ।

খ) Intelligent - বুদ্ধিমান ।

---

[৯] B.M. Gandhi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

[১০] ড. মোঃ শফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

[১১] সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

[১২] কাজী এবাদুল হক, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৯, পৃ. ১৫১

[১৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১

গ) An independent man - স্বাধীন ব্যক্তি ।

ঘ) A Muslim - একজন মুসলিম।

ঙ) An Adal - ন্যায়পরায়ণ।

চ) Good vision and listening ability - প্রগাঢ় দুরদর্শিতা এবং শ্রবণ ক্ষমতা।

ছ) Profound law scholarship - গভীর আইনী পাণ্ডিত্য।

জ) According to Mahabharata, it was essential for a judge to be familiar with the nature and the character of the people.

ঝ) The judges should be mild and polite and not very harsh.”

ঞ) Selection for Qazis post was also rendered from among the professors of law during the Sultanate and Mughal eras.

ট) The Qazis were supposed to not host parties nor receive presents from visitors.” [১৪]

বিচারক পদে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত যোগ্যতা গুলো বাংলার বিচার প্রশাসনে গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করা হতো।

অন্যদিকে বিচারক বা কাজীদের পদোন্নতি, পদায়ন, অপসারণ ও বদলি ইত্যাদিও সুলতান নিজে নিয়ন্ত্রণ করতেন। দুর্ণীতির অপরাধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। তাদের (*কাজী*) নিয়োগ, বদলি ও অপসারণ সুলতানের এখতিয়ারাধীন ছিল।[১৫]

---

[১৪] Sajida Faraz and Others, *Qualifications, Functions and Accountability of Qazis during the Salateen Period: An Overview*, Al-Azhar, Bi-Annual Research Journal of Islamic Studies, Volume ‘No-6, Issue: 1 (Jan-June 2020), The University of Agriculture, Peshawar, page-271, at http://www.al-azhar.org/index.phd/alazhar/article/download/212/93.

[১৫] আবদুস সালাম মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৩

বদাউনির মতে, অদক্ষতা ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেলে বাদশা এমনকি প্রধান বিচারপতিকেও বরখাস্ত করতেন বা পদাবনতি ঘটিয়ে অধস্তন কাজীর পদে নামিয়ে দিতেন।[১৬]

বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসনামলে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উচ্চ পরিমান বেতন ভাতা প্রদান করা হতো। প্রধান বিচারপতি ও প্রাদেশিক বিচারকদের মানসম্মত বেতন দেয়া হতো। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ সকলেই বেতন ভোগ করতেন।[১৭] উল্লেখ্য যে, সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলকের শাসনকালে রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি বছরে ৬০,০০০/ (ষাট হাজার) টাকা বেতন ভোগ করতেন।[১৮] Ibn Battutah was appointed to this subordinate office and was given a salary of twelve thousand tankahs a year.[১৯] জানা যায় সুলতানী আমলে রৌপ্য মুদ্রাকে বলা হত “তঙ্কা”। এই মুদ্রা ছিল বর্তমান টাকার সমমানের, এর চেয়ে নিম্নমানের মুদ্রাও চালু ছিল যেমন জিতল, ফাল (পয়সা), ইত্যাদি।[২০] তৎকালীণ সময়ে সরকারি মুদ্রার নাম ‘টংকা’ ছিল। অন্যদিকে, বাংলায় বিনিময়ের মাধ্যম বা মুদ্রার সর্বনিম্ন ইউনিট হিসেবে কড়ির প্রচলন ছিল বলে তথ্য পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, বাংলার সুলতানগণ নিজস্ব টাকশাল থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন বলে বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যায়।

---

[১৬] কাজী এবাদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১

[১৭] লতিফুর রহমান ভাষান্তর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০

[১৮] ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৭

[১৯] Ishtiaq Husain Qureshi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০

[২০] আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪

খ. আদালতের এখতিয়ার

স্বাধীন সুলতানি আমলে বাংলার বিচারিক আদালত সমূহ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে আদালতের কাজ পরিচালনা করতেন। প্রতিটি আদালত পৃথক পৃথক অপরাধের বিচার করতো। আদালত সমূহের এখতিয়ার সুলতান নিজে নির্ধারণ করতেন। এক্ষেত্রে ধর্ম ও বিচার মন্ত্রণালয় এবং প্রধান কাজীর পরামর্শে সুলতান কেন্দ্রীয় আদালত থেকে সর্বশেষ গ্রাম পঞ্চায়েত আদালতের বিচারিক এখতিয়ার (Jurisdiction) সুনির্দিষ্ট করে দিতেন। ফলে আদালত সমূহ নির্ধারিত এখতিয়ারাধীন বিষয়বস্তুর বিচার করতেন। বিজ্ঞজনদের মতে, আদালতের এখতিয়ার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুলতান সাধারণত কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় নিতেন। মূলত আদালতের এখতিয়ার বলতে আদালতের বিচার করার আইনগত ক্ষমতাকে বুঝায়। বাংলায় সুলতানী শাসনামলে সাধারণত আদালত সমূহের এখতিয়ার নির্ধারণে নিম্নবর্ণিত মানদণ্ড (Criteria) বিবেচনা করা হতো বলে জানা যায়-

ক) বিষয়গত এখতিয়ার

খ) আদি এখতিয়ার

গ) আঞ্চলিক এখতিয়ার

ঘ) আর্থিক এখতিয়ার এবং

ঙ) আপীল এখতিয়ার।

স্বাধীন সুলতানী শাসনামলে বিচার ব্যবস্থার দুটি শাখা ছিল। একটি দেওয়ানী (Civil) এবং অপরটি ফৌজদারী (Criminal)। এই দুটি শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট বিরোধীয় বিষয়বস্তুর বিচার সম্পাদন করার জন্য আদালত সমূহের ভিন্ন ভিন্ন এখতিয়ার নির্ধারণ করে দেয়া হতো। বাংলার বিচার ব্যবস্থায় কোনো কোনো আদালত সর্বপ্রকার মামলার বিচারের এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারতেন। আবার কিছু আদালত শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট দেওয়ানী প্রকৃতির বা ফৌজদারী অপরাধের বিচারের এখতিয়ার প্রয়োগ করতো। জমি-জমা সংক্রান্ত এবং *দেওয়ান-ই-মাযালিম* এর আওতাভুক্ত নয় এমন বিষয়াদি দেওয়ানী মামলা নামে পরিগণিত হতো।[১]

তথ্যসূত্রঃ

---

১. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *মুসলিম প্রশাসনব্যবস্থা*, ঢাকা, বাধন পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ. ১৩৯

কাজেই যে বিষয়টি দেওয়ানী প্রকৃতির নয় বা যে বিরোধীয় বিষয়টি দেওয়ানী প্রকৃতির হলেও আইনে নিষেধ করা হয়েছে এরূপ বিষয়ের বিচার করার এখতিয়ার দেওয়ানী আদালতের ছিল না। অন্যদিকে, ফৌজদারী অপরাধের বিচার ফৌজদারী আদালতে করা হতো। অতএব, বিরোধীয় বিচার্য বিষয়ের উপর আদালতের এখতিয়ার আছে কিনা তা আইনে নির্ধারিত ছিল।

বাংলার বিচার ব্যবস্থায় গঠিত আদালত সমূহের এখতিয়ার সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হল।

মহামান্য রাজার আদালত ছিল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত। সুলতান স্বয়ং এ আদালতে বসতেন ও বিচার করতেন। এ আদালতের এখতিয়ার ছিল অসীম। The King's Court, presided over by the Sultan, exercised both original and appellate jurisdiction on all kinds of cases.[২] আপীল এখতিয়ারের ক্ষেত্রে এটি ছিল সুলতানের সর্বোচ্চ আদালত।[৩] কেন্দ্রীয় রাজধানীর অন্যতম ক্ষমতাবান আদালত হল *দেওয়ান-ই-মজলিশ*। এটি ছিল ফৌজদারী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আপীল আদালত।[৪] *দেওয়ান-ই-রিসালাত* রাজধানীতে অবস্থিত ছিল। এটি ছিল সর্বোচ্চ দেওয়ানী আপীল আদালত। The Court of *Diwan-e-Risalat* was the highest court of civil appeal.[৫] সদর জাহানের আদালত ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ের বিচার করতেন। জানা যায় ১২৪৮ সনে সুলতান নাসির উদ্দিন প্রধান বিচারপতির কার্যক্রমে অসন্তুষ্ট হয়ে *সদর-ই-জাহান* নামে সর্বোচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠা করেন এবং কাজী মিনহাজ-উস-সিরাজ কে এর বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করেন। ধর্ম সংক্রান্ত যেসব মোকদ্দমা প্রধান বিচারপতির আদালতে বিচারাধীন ছিল সেগুলো সদর জাহানের আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রধান বিচারপতির আদালতে উভয় এখতিয়ার ছিল।

---

[২] B.M. Gandhi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

[৩] আবদুস সালাম মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪২

[৪] ড. মোঃ শফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

[৫] B.M Gandhi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

এটি দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার মোকদ্দমারই বিচার করতো। *কাজী-উল-কুজ্জাত* বা প্রধান বিচারপতির আদালতে রাজধানীর সর্বপ্রকার মামলার বিচার করা হতো।[৬]

প্রাদেশিক আদালত সমূহের এখতিয়ারগুলো এলাকা বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ছিল। তখন প্রাদেশিক রাজধানীতে প্রাদেশিক প্রশাসক বা নাজিমের আদালতে নাজিম স্বয়ং আদি মামলা বিচার করতেন।[৭] তিনি প্রদেশে সুলতানের পক্ষে সভাপতিত্ব করতেন। তিনি সুলতানের মত আদি ও আপীল এখতিয়ার সম্পন্ন ছিলেন। *কাজী-ই-সুবা* এটি একটি প্রাদেশিক আদালত ছিল। এটিও আদি প্রকৃতির মামলার বিচার করতেন। He was empowered to try civil and criminal cases of any description and to hear appeals from the Courts of District Qazis. [৮] গভর্নরের বেঞ্চ আপীল মোকদ্দমার বিচারের জন্য গভর্নর এবং *কাজী-ই-সুবা*'র সমন্বয়ে গঠিত হতো। *দেওয়ান-ই-সুবা* প্রদেশে নির্ধারিত বিষয়ের বিচার করতো। মূলত এই আদালতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকৃতির অপরাধের বিচার করা হতো। এই আদালতের রাজস্ব সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আদি ও আপীল এখতিয়ার ছিল। The Court of Diwan-E-Subah was the final authority in the province in all cases concerning land revenue.[৯] প্রাদেশিক আদালত সমূহের মধ্যে সর্বশেষ আদালত হচ্ছে *সদর-ই-সুবা*র আদালত। প্রদেশে বৃত্তি প্রদান এবং ভূমিদান সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি *সদর-ই-জাহান*'র প্রতিনিধিত্ব করতেন। *সদর-ই-সুবা* ছিল প্রদেশে যাজক সংক্রান্ত সর্বোচ্চ আদালত।[১০]

জেলায় অবস্থিত আদালত গুলো ভিন্ন ভিন্ন এখতিয়ারের ফৌজদারী ও দেওয়ানী সংক্রান্ত উদ্ভূত অপরাধের বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করতো। জেলা কাজীকে *কাজী-ই-সরকার* বলা হত।

---

৬. কাজী এবাদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯

৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯

৮. B.M. Gandhi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

১০. মোঃ আবদুল হালিম, *বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা*, ঢাকা, সি.সি.বি ফাউন্ডেশন, আগস্ট,২০০৯, পৃ. ৩২

ফৌজদারী এবং দেওয়ানী উভয়বিধ আপীল ও আদিম এখতিয়ার এই (কাজী-ই-সরকার) আদালতের ছিল।[১১] ডডবক বা মীর আদিলের আদালত জেলা কাজীর আদালতের সহযোগী আদালত ছিল। জেলায় ফৌজদারের আদালত ছিল গুরুত্বপূর্ণ।ফৌজদারের আদালতে ক্ষুদ্র ফৌজদারী অপরাধের বিচার করার এখতিয়ার ছিল। The Court of the Faujdar tried petty criminal cases concerning security and suspected criminal.[১২] জেলার অন্যতম রাজস্ব আদালত ছিল আমিলের আদালত। আমিল জেলার রাজস্ব সংক্রান্ত সকল মোকদ্দমার বিচার করতেন।[১৩] সদর আদালত ভূমি বন্দোবস্ত এবং ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত মোকদ্দমার বিচার করতো।[১৪] সুলতানী বাংলার বিচার প্রশাসনে কোতোয়ালের আদালত ছিল বহুল পরিচিত। এটি পুলিশি মোকদ্দমা এবং পৌরসভা সংক্রান্ত বিষয় বিচার করত।[১৫]

প্রতিটি পরগণায় বাংলার সুলতানি আমলে দুইটি আদালত বিদ্যমান ছিল। আদালতগুলোর মধ্যে *কাজী-ই-পরগণা*'র আদালত দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় এখতিয়ার সম্পন্ন ছিল। অন্যদিকে কোতোয়ালের আদালত ক্ষুদ্র ফৌজদারী অপরাধের বিচারের অধিকারী ছিল। পরগণাতে *মুন্সিফ* ও *শিকদার* নামে দুইজন বিচারক নিযুক্ত ছিলেন।[১৬] বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসনামলে পরগণার শাসনকর্তাকে সিকদার বলা হত। পঞ্চদশ শতকে পরগণার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিকে সিকদার নামে অভিহিত করা হয়। গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ চট্টগ্রামের কোন অঞ্চলের জন্য হামিদ খানকে সিকদার নিযুক্ত করেন বলে জানা যায়। বাংলার সাহিত্য ও শিলালিপিতে সিকদারের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯০-১৫১৯ খ্রিঃ) এর রাজত্বকালে ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ -

---

[১১]. আবদুস সালাম মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৩

[১২]. B.M. Gandhi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

[১৩]. ড. মোঃ শফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

[১৪]. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

[১৫]. মোঃ আবদুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

[১৬]. আবদুস সালাম মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৩

একটি শিলালিপিতে মুন্সেফ নামক পদ ও পদাধিকারীর নামোল্লেখ দেখা যায়।[১৭] মুন্সিফ যাবতীয় দেওয়ানী মামলা ও শিকদার ফৌজদারী মামলার বিচার করতেন।[১৮] কোতোয়াল নির্বাহী এবং বিচারিক দায়িত্বও পালন করতেন। ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে দেবিকোট লিপিতে প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা বা কোতোয়াল বকালীর অধীনে প্রাদেশিক দপ্তর হিসেবে পুলিশ বিভাগ বা *দিওয়ান-ই-কোতোয়ালী*'র উল্লেখ রয়েছে।[১৯] The Kotwal also acted as a committing magistrate .[২০] তিনি নির্বাহী দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে ক্ষুদ্র ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করতেন।

বাংলার সুলতানী শাসনামলে গ্রামাঞ্চলের অপরাধ নিরোধের জন্য গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয় । গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোকদের নিয়ে গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরাই গ্রাম আদালত পরিচালনা করত। এ আদালতের এখতিয়ার সীমাবদ্ধ ছিল। The Panchayats did decide on a specific internal civil and criminal event.[২১] পঞ্চায়েত গ্রামের ছোটখাট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করতেন।

বাংলার বিচার বিভাগে আদালতগুলো নির্দিষ্ট এখতিয়ারে ফৌজদারী ও দেওয়ানী প্রকৃতির অপরাধের বিচার করতেন।

---

১৭. সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫

১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৩

১৯. মোকাদ্দেসুর রহমান অনুদিত- মমতাজুর রহমান বিরচিত, *হোসেন শাহী আমলে বাংলা (১৪৯৪-১৫৩৮ খ্রিঃ) একটি সামাজিক-রাজনৈতিক গবেষণা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, জুন ১৯৭১, পৃ. ৯২

২০. Ishtiaq Husain Qureshi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩

২১. Sajida Faraz And Others, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫

গ. আদালতের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

বাংলার সুলতানী আমলে একটি পরিপূর্ণ বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। কেন্দ্রীয় রাজধানীর আদালত, প্রদেশ, জেলা, পরগণা ও গ্রামে নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন আদালত ও বিচারক নিয়োজিত ছিল। আদালত সমূহ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে তাদের বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতো। ফৌজদারী ও দেওয়ানী প্রকৃতির অপরাধের বিচার পৃথক আদালতে সম্পন্ন হতো। মামলার আপীল, রিভিশন, স্থানান্তর ও রিভিউ ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষেত্র বিশেষে উচ্চ আদালতের ক্ষমতার আওতাভুক্ত ছিল। সালতানাতের সর্বোচ্চ বিচারক ও আদালত ছিল সুলতান। সুলতান স্বয়ং তাঁর আদালতে সভাপতিত্ব করতেন। সুলতান বিচারিক ক্ষমতা ও কার্যাবলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। রাজা বা সুলতানের আদালত সালতানাতের সর্বোচ্চ আপীল আদালত ছিল। সুলতানের সকল প্রকার দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করার ক্ষমতা ছিল। প্রজা সাধারণের অভাব-অভিযোগ, আবেদন- নিবেদন শ্রবণ করা সুলতানের অন্যতম রাজকীয় কর্তব্য ছিল।[১] তিনি ফৌজদারী অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিচার অনুষ্ঠানও করতেন।[২] সুলতান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মামলা সমূহ বিচার করতেন। সুলতান সম্ভবত রাজদ্রোহ বা ধর্মদ্রোহ বিষয়ক বিচার করতেন।[৩] সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে সুলতান একমাত্র নির্বাহী ছিলেন। মৃত্যুদণ্ড প্রদানের আদেশ দেয়ার অধিকার কেবল সুলতানেরই ছিল এবং মৃত্যুদণ্ড প্রদানের পূর্বে আদালতকে তাঁর পূর্বানুমতি নিতে হতো। সুলতান রুকনউদ্দিন বারবক শাহ রাজদ্রোহিতার অপরাধে তাঁর সেনাপতি শাহ ইসমাইল গাজীর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন।[৪] বিদ্রোহীর নিরাপত্তা, জীবন ও সম্পত্তি রাজার দয়ার উপর টিকে থাকত।

তথ্যসূত্রঃ

---

১. সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫

২. লতিফুর রহমান (ভাষান্তর), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮

৩. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম এবং অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭

৪. প্রফেসর মোঃ আবদুল করিম, *বাংলায় মুসলিম প্রশাসন-ব্যবস্থা ইতিহাস, (মধ্য যুগের বাংলা ইতিহাস), (১২০৫-১৭৫৭ খ্রিঃ)*, ঢাকা, রুদ্র প্রকাশন, মে-২০২২, পৃ. ৮৫

A rebel's life and property were at the mercy of the Sultan; as this was well known, a rebel took the risk with his eyes open.[৫]

অপরাধীর সাজা হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষমতা সুলতানের ছিল। King and governor also had the power to remit the sentence.[৬] Only the king had the power to enhance the punishment.[৭] তিনি যে কোনো অপরাধীর শাস্তি মওকুফ বা হ্রাস করতে পারতেন। সুলতানের আদালত সর্বোচ্চ আপীল আদালত। সুলতানের প্রদত্ত রায় সার্বজনীন ও পালনীয় ছিল। বিচার বিভাগীয় প্রশাসনিক কাঠামোতে সুলতান ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারপতি এবং আপীলের ক্ষেত্রে তাঁর প্রাধান্য বজায় থাকত।[৮] বিচার কাজে তিনি যে রায় প্রদান করতেন তাই ছিল সর্বোচ্চ এবং অলঙ্ঘনীয়।[৯] কাজীদের রায় পুনঃবিচার করার ক্ষমতা একমাত্র সুলতানের ছিল। অনেক সময় কাজীর রায় পুণর্মূল্যায়ন করতেন সুলতান।[১০] সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-৮১খ্রি.) নিজে বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাই যে সমস্ত মামলায় কাজীরা রায় প্রদানে ব্যর্থ হতো, সেগুলোর অধিকাংশেরই তিনি নিজে নিষ্পত্তি করতেন।[১১] আরও কথিত আছে যে, কাজীরা যেসব ব্যাপারে ন্যায়বিচার করতে অসমর্থ হতেন সেসব ব্যাপারে সুলতান নিজেই বিচার করতেন।[১২]

---

৫. Ishtiaq Husain Qureshi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩

৬. Attia Madni and Others, *Administration of Justice in Medieval India: An Analytical Study of Legal Systems of Salateen of Delhi, Journal of Historical Studies, Vol.-v. No.11 (July-December 2019)* at https://jhs.bzu.edu.pk/upload/vo1%2011-19_8%20administration%20of%20justice%20in%20the%20sultanate%20of%20delhi.pdf51.pdf , P.140,

৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩

৮. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮

৯. সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫

১০. এ কে এম শাহনাওয়াজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫

১১. প্রফেসর মো: আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

১২. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৫

অর্থঋণ আইনে ঋণদান ও আদায় করার বিষয়ে সুলতানের ক্ষমতা ছিল একচ্ছত্র। দিল্লীর সুলতানী শাসনামলের ঋণদান বিষয়ে বিখ্যাত পর্যটক মার্কোপোলো বলেন, "সুলতানী আমলে ঋণসংক্রান্ত আইন ছিল খুবই কঠোর এবং ঋনদাতা ঋণ আদায়ের জন্য সুলতানের সাহায্য নিতেন।"[১৩] বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলে বিচারিক আদালতে মামলা স্থানান্তর করার ক্ষমতা সুলতানের হাতে সীমাবদ্ধ ছিল। ন্যায়বিচারের স্বার্থে সুলতান এক আদালত হতে অন্য আদালতে মামলা স্থানান্তর (Transfer) করতেন। Only the king and the governor had the power to transfer the case from one court to another.[১৪] বাংলার সুলতান বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তা হিসেবে অধস্তন আদালত সমূহে কাজী ও অন্যান্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ,বদলী,অপসারণ ও পদোন্নতি প্রদান করতেন। অন্যান্য বিচারকদেরও সুলতান নিয়োগ করতেন।[১৫] গভর্নরের নিয়োগ, বদলী ও পদচ্যুতি ছিল সম্পূর্ণরূপে সুলতানের ইচ্ছাধীন।[১৬] সুলতান কাজীদের ক্ষমতাকে বিচারকার্য, ধর্মীয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল।[১৭] সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও অপরাধ দমনে সুলতান কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতো। Being top of the state, he was the incomparable power to oversee equity in his realm.[১৮]

বাংলার কেন্দ্রীয় রাজধানীর আদালতের মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আপীল

---

১৩. মাহবুবুর রহমান, *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, সুলতানী আমল (৭১২-১৫২৬ খ্রিঃ) ১ম খণ্ড*, ঢাকা, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, জুলাই ২০১৯ পৃ. ৩৪২

১৪. Attia Madni and Others, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০

১৫. সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫

১৬. ড. মুহাম্মদ আলী আসগর খান ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৯

১৭. সতীশ চন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫

১৮. Vanshika Shukla, *Judiciary in Medieval India: The Perspective of Sultanate Law, International Journal of Multidiciplinary Educational Research, Vol.10*, Issue: 8(6), August 2021, P. 26 at http://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ijmer/pdf/volume10-issue8%286%29/5.pdf

আদালত হলো *দেওয়ান-ই-মজলিসের* আদালত। এ আদালত ফৌজদারী মামলার আদি ও আপীল ক্ষমতা প্রয়োগ করতো। *নাজিম-ই-সুবার* আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে রাজধানীর কেন্দ্রীয় আপীল আদালতে আপীল করা যেত। *দেওয়ান-ই-রিসালাতে* দেওয়ানী মামলার বিচারিক ক্ষমতা ছিল। এটি ছিল দেওয়ানী মামলার সর্বোচ্চ আপীল আদালত।

কেন্দ্রীয় আদালত সমূহের অন্যতম ক্ষমতাধর আদালত হলো 'সদর-ই-জাহানের আদালত। এই আদালতের ব্যাপক ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। His duties include: appointment of Qazis in all other courts, administration of justice, issuance of letters and recommendations to subordinate officers, high courts of appeal and jurisdiction in all matters.[১৯] His other duties include, decision of all cases (iqta), grant of titles (khitabat), leadership in prayers (Immamat) and supervisor of all religious issues.[২০] বাংলার সুলতানী বিচার প্রশাসনে প্রধান বিচারপতির আদালতের বহুবিধ ক্ষমতা ও কার্যাবলির ব্যবহার দেখা যায়। দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকৃতির অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা ছিল। এই আদালতের আপীল ক্ষমতাও ছিল। সুলতানকে বিচার কাজে সাহায্য করা, আইনসংক্রান্ত বিষয়ে সুলতানকে উপদেশ দেয়া, প্রাদেশিক বিচারকের কার্যাবলি দেখা, জটিল দেওয়ানী ও ফৌজদারী অপরাধের বিচার করা প্রভৃতি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা তার দায়িত্বের মধ্যে ছিল।[২১] তিনি ছিলেন মূলত রাষ্ট্রের বিচারপতি এবং ধর্ম সংক্রান্ত অভিযোগও তিনি বিচার করতেন।[২২]

In the begining of Muslim empire, the Qadi's function was to settle disputes, but later his jurisdiction widened considerably and embraced-

---

[১৯] Sardar M.A. Waqar Khan Arif, *The legel System of Sultans of Delhi: An overview, Vol-6 No. 12 (2017)*, International Journal of Development and Sustainability, P-1990, at www.isdsnet.com/ijds

[২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯০

[২১] মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৮

[২২] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯

the supervision and management of the property of orphans and lunatics, the execution of testamentary dispositions and the supervision of awqaf; he even helped destitute widows to find suitable husbands.[২৩]

প্রধান বিচারপতির আদালত আপীল পূণঃর্বিচার করতে পারতেন। *কাজী-ই-সুবা'*র আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হতো কেন্দ্রীয় প্রধান বিচারপতির আদালতে।[২৪] The Qadi could revise his own judgment on the basis of fresh evidence or even of reasoning on his own part.[২৫] বাংলার কেন্দ্রীয় রাজধানীর সর্বশেষ আদালত ছিল *দেওয়ান-ই-সিয়াসত*। ১৩৫১ সালে বাদশাহ মোহাম্মদ বিন তুঘলক বিদ্রোহীদের বিচার করার জন্য রাজধানীতে *দেওয়ান-ই-সিয়াসত* নামক আদালত সৃষ্টি করেছিলেন।[২৬] এটি মূলত সামরিক আদালত ছিল। যুদ্ধবন্দি, যুদ্ধ অপরাধী, আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী সৈনিক, রাষ্ট্রদ্রোহী প্রভৃতি শ্রেণির অপরাধীদের অভিযুক্ত করে বিচারের জন্য সামরিক আদালতে বিচার করা হত।[২৭]

প্রদেশে *নাজিম-ই-সুবা'*র আদালতে আদি মামলার বিচার করার ক্ষমতা ছিল । এই আদালতের আপীল শোনা ও নিষ্পত্তির ক্ষমতা ছিল। *কাজী-ই-সুবাহ'*র আদালত থেকে আপীল শোনা হত *নাজিম-ই-সুবাহ'*র আদালতে।[২৮] ফৌজদারের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে নাজিমের আদালতে আপীল করা যেত।[২৯]

প্রাদেশিক *কাজী-ই-সুবা'*র আদালত দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় শ্রেণির মোকদ্দমার বিচার করতেন। এ আদালতের আপীল ক্ষমতাও ছিল। জেলা কাজীর রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের-

---

২৩. Ishtiaq Husain Qureshi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০

২৪. আবদুস সালাম মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৫

২৫. Ishtiaq Husain Qureshi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১

২৬. কাজী এবাদুল হক, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৯, পৃ. ১৪৯

২৭. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০

২৮. মোঃ আবদুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

২৯. কাজী এবাদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০

হতো এই আদালতে।[৩০] তাছাড়া *কাজী-ই-সুবাহ্* বিচার প্রশাসনের তত্ত্বাবধান করতেন এবং জেলার কর্মরত কাজীগণ তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করছেন কিনা সেটাও দেখতেন।[৩১] He was responsible for administration of justice in province.[৩২] প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন প্রাদেশিক সরকারের প্রধান কর্মচারী। প্রাদেশিক গভর্নরের কাজ ছিল কাজীদের সহায়তা করা ও বিচারকের রায় কার্যকর করা। তিনি বিচারক নিয়োগ, কর আদায়, ইসলামী আইন কানুন প্রয়োগ এবং ইসলাম ধর্মের রক্ষাকর্তা হিসেবে গণ্য ছিলেন।[৩৩]

It was the duty of the local governors and officials to help Qadi in maintaining the dignity of the law and to co-operate with him in bringing wrong -doers to their senses.[৩৪] His main function was to maintain law and order in the province.[৩৫] প্রদেশে রাজস্ব আদালত ছিল *দেওয়ান-ই-সুবা'র* আদালত। রাজস্ব বিষয়ক যাবতীয় মামলার বিচার এই আদালতে হত।[৩৬] এ আদালতে জেলার আমিলের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শোনা হত।[৩৭] প্রদেশের সর্বশেষ আদালত হল *সদর-ই-সুবা'*র আদালত। আদালত *সদর-ই-সুবা* প্রদেশের ধর্মীয় বিষয়াদি সংক্রান্ত সর্বোচ্চ আদালত।[৩৮] এটি প্রদেশে বৃত্তি প্রদান, ভূমিদান সংক্রান্ত বিষয়ও পরিচালনা করতো। He used to decide only those cases which are not in the jurisdiction of the Qazis.[৩৯]

---

[৩০] আবদুস সালাম মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৫

[৩১] মো: আবদুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১

[৩২] Sardar M.A. Waqar Khan Arif, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯১

[৩৩] ড. মুহম্মদ আলী আসগর খান ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৭

[৩৪] Ishtiaq Husain Qureshi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০

[৩৫] Sardar M.A. Waqar Khan Arif, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯১

[৩৬] আবদুস সালাম মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৫

[৩৭] কাজী এবাদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯

[৩৮] আবদুস সালাম মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৫

[৩৯] Sardar M.A. Waqar Khan Arif, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯১

সদর-ই-সুবা জেলা সদরের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শুনতেন।[৪০]

জেলা *কাজী*র আদালত সকল প্রকার দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করতেন। এটা জেলার সর্বোচ্চ আপীল আদালত ছিল। এ আদালতে পরগণার কাজী, কোতোয়াল ও গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা যেত।[৪১]

He was the head in the district and used to decide minors, lunatics, missing persons and intestate property, waqf and Trust cases as well.[৪২] জেলা কাজী জেলার হাজত খানাও পরিদর্শন করতেন। জেলায় *মীর আদীল* বা *দাদবেক* এর আদালত ছিল। এই আদালত ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত অপরাধের বিচার করতেন।

ভুল রায় যাচাই এবং দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দ্রুত সাজা প্রদানের কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করাই *আমির-ই-দাদের* প্রধান দায়িত্ব ছিল।[৪৩] জেলায় ছোটখাট ফৌজদারী মামলা বিশেষত সন্দেহ জনক অপরাধী ও জনসাধারণের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ের বিচার করতেন ফৌজদারের আদালত। জেলায় ভূমিদান, সম্পত্তির নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত বিষয়ের বিচার করার ক্ষমতা ছিল সদরের আদালতে। জেলার রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের মামলার বিচার করা হত আমিলের আদালতে।

জেলার ক্ষুদ্র ফৌজদারী অভিযোগ ও পুলিশি মামলার বিচার হতো কোতোয়ালের আদালতে। রায় চৌধুরী, মজুমদার ও দত্ত কোতোয়ালকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী (Custodian of peace and order) বলে আখ্যায়িত করেন।[৪৪] The Kotwal also acted as a committing magistrate.[৪৫]

---

[৪০] কাজী এবাদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯

[৪১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০

[৪২] Sardar M.A. Waqar Khan Arif, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯১

[৪৩] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০

[৪৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

[৪৫] Ishtiaq Husain Qureshi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩

তিনি জনগণের সহযোগিতায় বিশৃঙ্খলাকারীদের একটি তালিকা প্রনয়ণ করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।[৪৬]

বাংলার পরগণায় দুটি আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। *কাজী-ই-পরগণা'র* আদালত পরগণায় উদ্ভুত সকল দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করতেন। এটি সর্বনিম্ন আদালত। এই আদালতের আপীল ক্ষমতা ছিল না। তিনি যাজক সংক্রান্ত মোকদ্দমারও বিচার করতেন।[৪৭] *কোতোয়াল* পরগণার ক্ষুদ্র ফৌজদারী অপরাধের বিচার করতেন। তিনি পরগণার প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি পুলিশ বিভাগ ও একজন সোপর্দকারী বিচারকের কর্তা।[৪৮]

বাংলার সুলতানী বিচার প্রশাসনে সর্বনিম্ন আদালত ছিল গ্রাম আদালত। এ আদালতকে গ্রাম পঞ্চায়েত বলা হতো। গ্রামের পঞ্চায়েতই গ্রামের শান্তি রক্ষার এবং গ্রামের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ভার নিতো।[৪৯] গ্রাম পঞ্চায়েতে স্থানীয় প্রকৃতির সবধরণের ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করতো।

অমুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত মামলা সাধারণত গ্রাম্য পঞ্চায়েত সমূহ মীমাংসা করে।[৫০] গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ছিল। As a general rule, the decision of the panchayat was binding upon the parties and no appeal was allowed from its decision.[৫১] বিরোধ নিষ্পত্তি করা ছাড়াও গ্রাম পাহারা দেওয়ার জন্য চৌকিদার নিযুক্ত করা, গ্রামের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, দরিদ্রদের সাহায্য করা, রাস্তাঘাট মেরামত করা, খেলাধুলা ও উৎসবাদির ব্যবস্থা করা গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ছিল।[৫২]

---

[৪৬] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

[৪৭] ড. শফিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০

[৪৮] ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯

[৪৯] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৬

[৫০] ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯

[৫১] B.M. Gandhi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

[৫২] কাজী এবাদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩

গ্রাম পঞ্চায়েতে শালিস দরবার পরিচালনা করতেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান *মুকাদ্দাম*। পঞ্চায়েতের অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহিত হতো। বেশি জটিল মোকাদ্দমাগুলো তিনি পরগণা বা তদুর্ধ আদালতে সোপর্দ (Refer) করতেন। গ্রাম্য আদালতে ছোট-খাট অপরাধের জন্য তিরস্কার ও সংশোধনমূলক শাস্তি দানের প্রথা-প্রচলিত ছিল। দোষী আসামীকে নাকে খত দেয়, মাথা মুণ্ডন করা, নাকে মুখে বা ন্যাড়া মাথায় চুনকালি লাগিয়ে কিংবা গলায় জুতার মালা পড়িয়ে রাস্তায় ঘোরানো হতো।

অনৈতিক কাজের জন্য সমাজচ্যুত করা হতো। কোন কোন ক্ষেত্রে বাদীকে ক্ষতিপূরণের জন্য অপরাধীকে জরিমানাও করা হতো। গ্রাম পঞ্চায়েতের এসব সুবিচারমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

শাস্তির ধরণ ও প্রয়োগ

ক. শাস্তির প্রকার বা ধরণ

খ. বাংলার বিচার ব্যবস্থায় শাস্তির প্রয়োগ

ক. শাস্তির প্রকার বা ধরণ

বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসনামলে বিচার প্রশাসন একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিচারের মাধ্যমে অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি নির্ণয় করা হতো। মূলত বাংলার সুলতানী শাসন মুসলিম সুলতানদের দ্বারা পরিচালিত হয়। সুলতানগণ কুরআন ও শরয়ী বিধান মেনে চলতেন। বিচার বিভাগের মাধ্যমে অপরাধীদের শাস্তি আরোপ মুসলিম আইন অনুযায়ী করা হতো। সুলতানী শাসনামলে মুসলমানেরা প্রধানত সুন্নি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল। বাংলার শাসন ব্যবস্থায় ইমাম আবু হানিফা সম্পাদিত ফিকাহ্‌র প্রভাব ছিল। সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪১০ খ্রিঃ) একজন হানাফি ছিলেন। অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফার ফিকাহ্ শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে শেখ বুরহানুদ্দিন আলীর লিখিত ***আল হেদায়া*** এই উপমহাদেশে অনুসরণ করা হতো। অন্যদিকে, দিল্লীর সুলতানী শাসনামলের বিচার ব্যবস্থা প্রধানত ফিকাহ্ শাস্ত্রের বিধান মতে পরিচালিত হতো। বিচারে অপরাধের প্রকার ও ধরণ, অপরাধ নিরূপণ এবং অপরাধীকে দণ্ডিত করা ইত্যাদি ফিকাহ্ শাস্ত্র ও শরয়ী বিধান মতে করা হতো। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুসলমানগণ তাদের সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ***তাশরী*** আইনের আওতাধীন ছিল।[১] অন্যদিকে মুজাফ্‌ফর শাম্‌স্ বলখির চিঠিগুলোতেও দেখা যায় বলখি বারবার গিয়াসুদ্দীন কে শরিয়তের বিধান পালন করতে ও ন্যায়পরায়ণ হতে নির্দেশ দিতেন।[২] দেখা যায়, দিল্লীর সুলতানী আমলের বিচারিক সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে ফার্মিঞ্জার লিখেছেন, “The authoritative writing of Aboo Haneefa, and his disciples Aboo Yousuf and Imam Mohammud govern judicial decisions in India”.[৩] During the Muslim period Islamic law or Shara was followed by all the Sultans and Mughal Emperors.[৪]

তথ্যসূত্রঃ

---

১. লতিফুর রহমান (ভাষান্তর), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭

২. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪

৩. সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩

৪. B.M. Gandhi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

এ থেকে অনুমান করা যায় বাংলার বিচার ব্যবস্থা শরয়ী আইন দ্বারা পরিচালিত হতো এবং অপরাধীর দণ্ড বা শাস্তিও ইসলামী আইন মতে আরোপ ও প্রয়োগ করা হতো। বাংলার সালতানাতের বিচারে দণ্ড প্রাপ্তদের প্রচলিত শাস্তির ধরণ আলোচনা করার পূর্বে ইসলামী আইন অনুযায়ী শাস্তির সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিস্তারিত বর্ণনা করা একান্ত আবশ্যক।

শাস্তি অর্থ সাজা, দণ্ড, নিগ্রহ, অত্যাচার ইত্যাদি। শাস্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ Punishment বা Penalty ইত্যাদি। শাস্তির আভিধানিক অর্থ হল মানুষকে তার অপকর্মের প্রতিদান দেয়া।[৫] শাস্তির পারিভাষিক সংজ্ঞা বা পরিচয় প্রসঙ্গে যে সব অভিমত পাওয়া যায় তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল। শরিয়তের পরিভাষায় শাস্তি বলতে কাউকে তার অপকর্মের জন্য শারিরীক ও মানসিক যাতনা বা উভয়বিধ কষ্ট দেয়াকে বোঝানো হয়।[৬] অপরাধের জন্য আইন দ্বারা নির্ধারিত প্রতিফলকে 'শাস্তি' বলে।[৭] আবদুল কাদীর আওদাহ বলেন, "শাস্তি হলো, শরী'আত প্রবর্তক (আল্লাহ ও তাঁর রাসুল) এর নির্দেশ অমান্য করার কারণে জনগণের কল্যাণে বিধিবদ্ধ প্রতিফল"।[৮] শরয়ী আইন মতে, "অপরাধের ধরণ অনুযায়ী উহার শাস্তি নিম্নোক্ত তিন শ্রেণিতে বিভক্ত-

(ক) হদ্দ,
(খ) কিসাস ও দিয়াত এবং
(গ) তাযীর।[৯]

---

[৫] ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৯, পৃ. ২৪

[৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

[৭] গাজী শামসুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (১ম খন্ড, ১ম ভাগ)*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ. ১১

[৮] নুর মোহাম্মদ, *ইসলামী ও প্রচলিত আইনে শাস্তির উদ্দেশ্যঃ তুলনামূলক পর্যালোচনা*, ভলিউম-১৬, ইস্যুঃ ৬২ এবং ৬৩, ইসলামী আইন ও বিচার, ঢাকা, এপ্রিল-জুন এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০২০, পৃ. ১৫২

[৯] গাজী শামসুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

প্রথম শাস্তি হলো হদ্দ। হদ্দ আরবি শব্দ; এর বহুবচন হল হুদুদ। এর আভিধানিক অর্থ বাধা দান বা বারণ করা। হদ্দ হল নির্ধারিত শাস্তি; ইহা কার্যকর করা বাধ্যতামূলক।[১০] নিম্নোক্ত অপরাধকর্ম সমূহ হদ্দের আওতাভূক্ত-(ক) যেনা, (খ) চুরি, (গ) ডাকাতি, (ঘ) মদ্যপান ও

(ঙ) যেনার অপবাদ।[১১] তবে কোন কোন ফকীহ ধর্মান্তর ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার শাস্তিকেও হদ্দ বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় শাস্তি কিসাস। কিসাস শব্দের অর্থ একইরূপ কাজ করা, পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলা। পরিভাষায় কোন ব্যক্তিকে হত্যা বা আহত করার দায়ে হত্যাকারীকে বা আহত কারীকে পর্যায়ক্রমে হত্যা বা আহত করাকে কিসাস বলে।[১২] অন্যভাবে বলতে গেলে অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা বা সাদৃশ্য বিধান করাকে কিসাস বুঝায়।

অন্যদিকে, মনুষ্য হত্যার ক্ষেত্রে আদালতের মাধ্যমে পক্ষবৃন্দের আপোষ রফার ভিত্তিতে যে অর্থ প্রদান করা হয়, তাকে *দিয়াত* বলে।[১৩] তৃতীয় সাজা হল তা'যীর। যার অর্থ হলো তিরস্কার করা, নিষেধ করা, বাধা দেয়া, ফিরিয়ে রাখা, শিষ্ঠাচার শিক্ষা দেয়া ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায় তা'যীর হল, "আল্লাহ বা মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট যে সব অপরাধের জন্য শরী'আত নির্দিষ্ট কোন শাস্তি কিংবা কাফফারা নির্ধারণ করে দেয়নি, সে সব অপরাধের শাস্তিকে তাযীর বলে।[১৪] তাযীরের আওতায় অপরাধীকে তিরস্কার, সতর্কীকরণ, বেত্রাঘাত, সম্পদ আটক ও কয়েদ করা যেতে পারে এবং জননিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত উন্নীত হতে পারে।[১৫]

বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ তাঁদের শাসন ও বিচার কার্যে শরয়ী বিধান অনুসরণ করতেন।

---

১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

১৪. ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

১৫. গাজী শামসুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

বিশেষতঃ বিচার কার্যে ইসলামী আইনের অনুসৃত নীতিমালা পালন করা হত। রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য অপরাধীদের অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা অনুযায়ী শাস্তির বিধান করা হতো। বাংলার সুলতানদের শাসনামলে অপরাধীদের শাস্তি বা দণ্ড নিয়ে-

ঐতিহাসিকদের ভিন্ন ভিন্ন মতামত লক্ষ্য করা যায়। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আবদুল করিম বলেন "চীনা বিবরণে দুই প্রকার শাস্তির উল্লেখ পাওয়া যায়- প্রহার এবং নির্বাসন"।[১৬] রায় চৌধুরী, মজুমদার ও দত্ত Advanced History of India -তে বলেন যে "The Penal law was excessively severe; the penalties of mutilation and death being usually inflicted on the culprit." অর্থাৎ সুলতানী আমলে শাস্তির বিধান ছিল খুবই কঠোর ও দণ্ডের মধ্যে অঙ্গচ্ছেদ এবং মৃত্যু অন্তর্ভূক্ত ছিল।[১৭] কখনো কখনো দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে আগুনে নিক্ষেপ করা হত।[১৮] অপরাধীকে কারারুদ্ধ বা জেলে পাঠানো হতো।[১৯] মুহাম্মদ বিন তুঘলক মাতালকে আশি বেত্রাঘাত ও তিন মাসের নিঃসঙ্গ কারাবাসের শাস্তি প্রদান করেন।[২০] এছাড়া বাংলার সুলতানী আমলে অপরাধের শাস্তি হিসেবে পা, নাক, কান ইত্যাদি কেটে নেয়া, চোখ উপড়ে ফেলা, গলায় গরম সীসা ঢেলে দেয়া, হাত পায়ের শিরা কেটে দেয়া, করাত দিয়ে দেহ বিচ্ছিন্ন করা এবং প্রস্তর নিক্ষেপ করা ইত্যাদি আরোপ করা হতো। উল্লেখ্য যে, শাস্তি হিসেবে আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা জরিমানাও প্রচলন ছিল।

---

১৬. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৬

১৭. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০

১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

১৯. মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪২

২০. এ. কে. এম আবদুল আলীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪

খ. বাংলার বিচার ব্যবস্থায় শাস্তির প্রয়োগ

বাংলার সুলতানী শাসনামলে অপরাধীর শাস্তি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সুলতানগণ কঠোর ছিলেন। মূলত বাংলার শাসন ব্যবস্থায় কুরাআনি আইন ও বিধি অনুসরণ করায়, অপরাধের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেমন সুলতানগণ অনমনীয় ছিলেন তেমন সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে অপরাধ নির্মূল করাও তাঁদের লক্ষ্য ছিল। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অপরাধীদের বিচারের মাধ্যমে শাস্তির মুখোমুখি করা হতো। প্রকৃতপক্ষে অপরাধীকে কষ্ট দেয়া নয়, সংশোধন করা এই নীতিতে শাস্তির প্রয়োগ করা হতো। ইসলামী আইনে শাস্তি প্রয়োগ ও প্রবর্তনের বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করা, সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা ও অপরাধে সম্পৃক্ত থাকার ব্যাপারে অপরাধীদের মনে ভীতি সঞ্চার করা শাস্তির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। শাস্তি প্রয়োগের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে নানাবিধ মতামত পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইসলামী আইনজ্ঞ আবদুল কাদীর আওদাহ্ (মৃ.১৩৭৩) রহ. বলেন, শাস্তির ভিত্তি হলো জনসাধারণের কল্যাণের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সার্বজনীন শৃঙ্খলা রক্ষা করা।[১] বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসনামলেও শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল একইরূপ। সামগ্রীকভাবে অপরাধের শাস্তি প্রয়োগে যে বিষয়গুলো প্রাধান্য দেয়া হয় তা হল-

ক) জনকল্যাণ ও জননিরাপত্তা। [২]

খ) অপরাধ প্রবণতা রোধ করা। [৩]

গ) দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। [৪]

ঘ) প্রাণ রক্ষা। [৫]

তথ্যসূত্রঃ

---

[১] নুর মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫

[২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫

[৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬

[৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮

[৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮

ঙ) পবিত্রকরণ ও সংশোধন। [৬]

চ) রাগের প্রশমন ও সান্ত্বনা দান। [৭]

ছ) ভারসাম্যপূর্ণ দণ্ড বিধি প্রণয়ন। [৮]

জ) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ধারা অব্যাহত রাখা। [৯]

ঝ) সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। [১০]

ঞ) দ্বীন নিয়ে উপহাস বন্ধ করা। [১১]

ট) হয়রানি বন্ধ করা। [১২]

ঠ) রহমত প্রাপ্তি [১৩] ইত্যাদি।

বাংলার স্বাধীন সুলতীন শাসনামলে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অপরাধের শাস্তি প্রয়োগে সুলতানগণ দৃঢ় ও সংকল্পবদ্ধ ছিল। এ সময় বিচারিক আদালতের রায়ে সাব্যস্ত দোষীদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হতো। দণ্ডবিধির আইন খুবই কঠোর ছিল। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দিল্লীর সুলতানগণের কঠোরতার দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন অপরাধীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ও নির্দয় ছিলেন। আবার অপরাধের শাস্তি প্রয়োগের বিপরীত অপরাধীর পুনর্বাসন করার দৃষ্ঠান্তও দেখা যায়। ফিরোজ শাহ অপরাধীদের পুনর্বাসনে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এ কারণে তিনি “র্কম বিনিয়োগ সংস্থা” (Employment Exchange Bureau) গঠন করেন।[১৪]

---

৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০

৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১

৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২

৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২

১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩

১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪

১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫

১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫

১৪. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় সুলতানগণ অপরাধীর শাস্তি প্রয়োগে শূন্য সহনশীলতা প্রদর্শন করতেন। সুলতান অন্যায়কারী ও অপরাধীদেরকে তাঁর স্বাভাবিক কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা দ্বারা শাস্তি প্রদান করতেন। রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যাক্তিকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে কিংবা অঙ্গচ্ছেদ করে নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো।[১৫] Firuz Sha did not hesitate to execute a favourite who was found guilty of murder; nor did he allow a high state official to escape capital punishment for murdering an obscure student who tutored his children and was guilty of a love intrigue with a woman in nobleman's palace.[১৬] সুলতান রুকনউদ্দীন বারবক শাহ্ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিঃ) রাজদ্রোহিতার অপরাধে তারঁ সেনাপতি ইসমাইল গাজির মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন এবং সুলতান জালালউদ্দিন ফতেহ্ শাহ্ (১৪৮১-১৪৮৬ খ্রিঃ) ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে জনৈক হরিদাসকে বাইশ বাজারে প্রকাশ্যে প্রহার করার আদেশ দিয়েছিলেন।[১৭] কোথাও বিদ্রোহ হলে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বিদ্রোহের নেতাদেরকে শাস্তি দান করেই সুলতান ক্ষান্ত হতেন না, তাদের নগণ্য অনুচর ও অনুসারীদেরকেও সুলতান চরম শাস্তি প্রদান করতেন। রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত ব্যাক্তিকে ফাঁসি দেয়া হতো অথবা তার অঙ্গচ্ছেদ করে নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যুদন্ড দেয়া হতো।[১৮] রাজদ্রোহিতার অপরাধের শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড এবং ধর্মদ্রোহিতার অপরাধের শাস্তি ছিল প্রহার (লাঠি দিয়ে)।[১৯] কোনো মুসলমান হিন্দুর দেবতার নাম করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হতো এবং কখনও কখনও বিভিন্ন বাজারে নিয়ে গিয়ে তাকে বেত্রাঘাত করা হতো।[২০] সুলতানী বাংলার শাসনামলে অপরাধের শাস্তি হিসেবে কারাগারে বন্দি করে রাখা হতো। অপরাধের মাত্রা মাফিক কারারুদ্ধ করার প্রচলন ছিল এবং এজন্য কারাগার নির্মিত হয়।

---

[১৫] ড. মুহম্মদ আলী আসগর খান ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৯

[১৬] Ishtiaq Husain Qureshi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩

[১৭] প্রফেসর মোঃ আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

[১৮] মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪২

[১৯] প্রফেসর মোঃ আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

[২০] সুখময় মুখোপাধ্যয়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০৩

সুলতানদের ‘বন্দিঘর’ অর্থাৎ কারাগারও ছিল।[২১] পুরাতন দূর্গ সাধারণতঃ কারাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[২২] তখন অবশ্য সরকারী জেলখানা ছিলনা; বন্দীদের কোন একজন অফিসারের অধীনে রাখা হতো; কোন কোন সময় রাজদ্রোহীদেরকে দূর্গে বন্দী রাখা হতো।[২৩] মিনহাজের বিবরণ থেকে জানা যায়, আলী মর্দান খলজীকে (বখতিয়ার খলজির হত্যাকারী বলে কথিত) মোহাম্মদ শিরাণ খলজি কোতোয়াল সাফাহানির অধীনে কারারুদ্ধ করে রাখেন।[২৪] পরবর্তী কালে চৈতন্যভাগবতে বাংলার সুলতানদের বন্দিঘর (কারাগার) থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়, যেখানে বড় বড় (উচ্চপদস্থ) লোকদেরও আটক রাখা হতো।[২৫]

অপরাধের সাজা হিসেবে নির্বাসনের প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো অপরাধীকে সুলতানগণ অপরাধের সাজা হিসেবে নির্জন নির্বাসনে পাঠিয়েছেন।

এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, সুলতান সিকান্দর শাহ (১৩৫৮-৮৯ খ্রি.) মশহুর দরবেশ শেখ আলা-উল-হক'কে পাণ্ডুয়া থেকে সোনারগায়েঁ নির্বাসন দিয়েছিলেন।[২৬]

কখনও কখনও অপরাধের শাস্তি হিসেবে শারিরীক নির্যাতন ও পীড়ন প্রয়োগ করা হতো। জীবন্ত লোককে অপরাধের সাজা স্বরূপ জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করা হতো। অন্যদিকে প্রস্তর নিক্ষেপেও অপরাধের দণ্ড কার্যকর করা হতো। তাঁর (মুহাম্মদ বিন তুঘলক) আমলে ব্যভিচারে দোষী সাব্যস্ত রাজপরিবারের কোন এক মহিলাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়।[২৭] অপরাধের শাস্তি কার্যকরের দৃষ্টান্ত হিসেবে সুলতান বলবনের শাসনামলে এক মশহুর কাহিনী মুহাম্মদ আবুল কাসিম ফিরিশতা তাঁর রচিত ***নওরোজনামা*** এ উল্লেখ করেন। সুলতান বলবনের

---

[২১]. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০৩

[২২]. ড. মুহম্মদ আলী আসগর খান ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৯

[২৩].আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১৬

[২৪]. প্রফেসর মোঃ আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

[২৫].*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

[২৬].*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

[২৭]. এ.কে.এম. আবদুল আলীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪

-শাসনামলে বাদায়ুনের প্রশাসক, আস্থাভাজন মালিক বকবক, মত্ত অবস্থায় চাকরকে বেত্রাঘাতে হত্যা করেন।

নিহত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী সুলতানকে এ হত্যার বিচারের আবেদন করেন। সুলতান এ ঘটনায় মালিককে বেত্রাঘাতে নিহত করার আদেশ দেন। অন্যদিকে উক্ত- হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সুলতানের নিয়োজিত *বারিদ* (গুপ্তচর) এ সংবাদ সুলতানকে না পৌছানোর অভিযোগে সুলতান *বারিদ*কে জনসমক্ষে ঝুলে দেয়ার আদেশ দেন। অপর এক অভিজাত মালিক হায়বত যিনি অস্ত্রাগারের সুপারিনটেন্ডেন্ট ও অযোধ্যার প্রশাসক ছিলেন, তিনি মাতাল অবস্থায় এক ব্যাক্তিকে হত্যা করেন। ফলে সুলতান তাঁকে জনসমক্ষে ৫০০ (পাঁচশত) বার বেত্রাঘাতের নির্দেশ দেন। এমনকি হত্যাকারীকে রক্তঋণ পরিশোধের জন্য অর্থাৎ হত্যার জন্য নিহত ব্যাক্তির স্ত্রীর হাতে অর্পণ করা হয়। হত্যাকারী বহুকষ্টে ২০,০০০/ (বিশ হাজার) তঙ্কা নিহত ব্যাক্তির স্ত্রীকে প্রদান করে কোনমতে নিজেকে রক্ষা করেন।

`Balban inflicted the extreme penalty on a governor who was guilty of murder when he was drunk; Muhammad Bin Tughluq appeared as a defendant in a Qadi's court and after the case had been proved against him insisted on the penalty.[২৮]

দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলার স্বাধীন সুলতানী বিচার প্রশাসন কঠোর অবস্থানে ছিলেন। সুলতান হিসাব-নিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং দুর্নীতিবাজদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। অপরাধীকে তার কৃত অপরাধ স্বীকার করার জন্য শারিরীক নির্যাতন ও বলপ্রয়োগ করা হতো। শাস্তি প্রয়োগে বাংলার শাসকেরা নিরপেক্ষ ও আপোষহীন ছিলেন। ফলে দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি ভোগ করতেই হতো। আর এভাবেই বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলে অপরাধের শাস্তি প্রয়োগ করা হতো।

---

[২৮] Ishtiaq Husain Qureshi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক. বিচার ব্যবস্থার ফলাফল

খ. বাংলার বিচার ব্যবস্থার মূল্যায়ন

ক. বিচার ব্যবস্থার ফলাফল

স্বাধীন সুলতানী বাংলায় একটি নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ বিচার বিভাগের মাধ্যমে সুলতানগণ সাম্রাজ্যে অপরাধ নিবৃত্ত করা ও আইন শৃঙ্খলা (Law and Order) রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দিল্লীর সুলতানী শাসনামলেও একটি দক্ষ ও কার্যকর বিচার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে রাজ্যে আইনের শাসন (Rule of Law) এবং ন্যায়বিচার (Justice) প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। একটি স্বাধীন দেশের জন্য একটি নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ থাকা অপরিহার্য। বিচার বিভাগের মাধ্যমে যেমন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয় তেমনি আইনের জটিল বিষয় ব্যাখ্যা করাও বিচার বিভাগের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত ছিল। আইনের ব্যাখ্যা দান, বিভিন্ন মামলায় আইনের প্রয়োগ করা, আইন ভঙ্গকারীকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দান এ বিভাগের অন্যতম কার্য।[১] অন্যদিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যালান বলের মতে, "বিচার বিভাগের কাজ হচ্ছে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review), আইন ও সংবিধানের ব্যাখ্যা (Interpretation of Law and Constitution), রাজনৈতিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মধ্যে বিভিন্ন সংগঠনের বিরোধের মীমাংসা (Arbitration between Separate Institutions in the Political Process), বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ সমর্থন জ্ঞাপন (General Support for the Existing Political System), ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষণ (Protection of Individual Rights)।[২] বিশ্লেষণে দেখা যায় বিচার বিভাগের বহুবিধ কর্মযজ্ঞ রয়েছে। যা রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা আনয়ন করে। নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা, দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষা করা, অপরাধীর শাস্তি বিধান করা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, শাসন বিভাগকে পরামর্শ প্রদান করা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও রাষ্ট্রের কল্যাণে আইন প্রণয়ন করা ইত্যাদি কাজও বিচার

তথ্যসূত্র ঃ

---

১. ড. মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, ঢাকা, গ্লোব প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃ. ৩১০

২. অধ্যাপক নির্মল কান্তি ঘোষ, *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা*, কলিকাতা, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, মার্চ ২০০০, পৃ. ৫২১

বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসনামলেও বিচার বিভাগ একই কাজ করেছে।

বাংলার সুলতানী আমলে দক্ষ বিচার বিভাগের মাধ্যমে রাজ্যে ন্যায়বিচার করে অপরাধীর শাস্তি প্রয়োগ বা কার্যকর করার ফলে সাম্রাজ্যে সর্বপ্রকার অপরাধ ও অন্যায় কাজ দমন করা সম্ভব হয়েছে। স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বিচারের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন হয়েছিল। বাংলার বিচার ব্যবস্থার কঠোর অবস্থানের প্রভাবে সাম্রাজ্যে সবধরণের পাপাচার ও বে-আইনী কাজ নির্মূল করা সম্ভব হয়েছিল। আইন ও বিচারের কঠোর বাস্তবায়নের ফলে অপরাধ মূলোৎপাটন করে শান্তি শৃঙ্খলা, সুশাসন, নিরাপত্তা, সুনীতি ও ন্যায়পরায়ণতা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুলতানী বাংলায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে সামাজিক অস্থিরতা, দূরাবস্থা, নিপীড়ন ও বিশৃঙ্খলা সমাজ থেকে দূরীভূত হয়েছিল। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, “ সুলতানের ন্যায়বিচারের জন্য লোকে এত ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকত যে, ভৃত্য এবং ক্রীতদাসদের প্রতিও লোকে দূর্ব্যবহার করতে সাহস পেতো না।[৩] সুলতানী শাসনামলে বাংলায় চুরি, ডাকাতি ও দস্যুতা ইত্যাদি অপরাধ নির্মূল করা সম্ভব হয়েছিল একটি কার্যকর বিচার প্রশাসনের কারণে। তৎকালীন সময়ের আইন ও বিচার এসব অপরাধ দমনে আপোষহীন ছিল। ফলে চুরি, ডাকাতি ও দস্যুতামূলক অপরাধে জড়িতদের বিচারের মুখোমুখি হয়ে শাস্তি ভোগ করতে হতো। ভাগীরথী নদীর মোহনা অঞ্চল, পদ্মা-মেঘনা-কর্ণফুলীর মোহনা অঞ্চলে দেশীয় জলদস্যুদের উৎপাত দেখা যায়। বাংলার বিচার বিভাগ ও সুলতানগণের কার্যকর বিচারিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দস্যুতা বৃত্তি শূণ্যের কোটায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল। বাংলার শাসনামলে ন্যায়বিচার ও আইনের যথার্থ প্রয়োগের ফলে রাজ্য হতে চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ ও দস্যুতা শক্তভাবে দমন করা সম্ভব হয়েছিল। দস্যুদের বিরুদ্ধে সুলতান সর্বদা কঠোর ছিলেন এবং তাঁর ভয়াবহ শাস্তি প্রদান দ্বারা দস্যুবৃত্তি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। ঐতিহাসিক বাদায়ুনের বিবরণ অনুসারে আফগান সরকারের আমলে দস্যুদের কার্যকলাপ কঠোর হস্তে দমন করা হতো।[৪]

---

৩. মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩

৪. সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩

ঐতিহাসিক এ.এল শ্রীবাস্তব বলেন, "অপরাধীর শাস্তি বিধানের কঠোরতার ফলে দেশের কোথাও চুরি-ডাকাতি সংঘটিত হতো না। পথিকগণ নিশ্চিন্তে রাজপথে নিদ্রা যেতে পারতো এবং বণিকগণ পণ্যসম্ভার নিয়ে নির্ভয়ে বাংলাদেশ হতে কাবুল এবং তেলিঙ্গনা হতে কাশ্মীর যাতায়াত করতে পারতো"।[৫] According to Beveridge, "robbery and theft formerly common were almost unknown and the travelers slept securely on highways and the merchants carried their commodities in safety from the sea of Bengal to the mountains of Kabul and from Talingana to Cashmere.[৬] বাংলার সুলতানী শাসনামলে মদ্যপান, উৎপাদন ও বাজারজাত করণের ব্যাপক প্রচলন ছিল। মদ্যপানে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সুলতানগণ মদ্যপান ও বিপনন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বিচারের মাধ্যমে মাতাল (Drunken) কে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হতো। অন্যদিকে দিল্লীর সুলতানগণও মদ্যপানের বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন। যৌবনে গিয়াস-উদ-দীন বলবনের পানাভ্যাস ছিল কিন্তু সিংহাসনারোহণের পর তিনি সুরা পাণের ঘোর শত্রু হয়ে পড়েন এবং কঠোর দণ্ডাজ্ঞা জারি করে রাজ্যে সুরাপান ও সুরা তৈরি নিষিদ্ধ করে দেন।[৭] আলাউদ-দীন খিলজী ফরমান জারি করলেন যে, মদ অথবা মাদকতা উৎপাদনকারী কোন পানীয় সেবন করলে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে।[৮] বাংলার সুলতান শামস-উদ-দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রি.) এর সময়ে কেউ প্রকাশ্যে মদপান করতে পারতো না বা অসৌজন্যমূলক আচরণ করতে পারতো না।[৯] বাংলার সুলতানগণ তাঁদের শাসনামলে রাজ্যের অধিবাসীদের জান-মালের নিরাপত্তা রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্যই হলো রাজ্যের জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তার বিধান করা।

---

৫. মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮

৬. Attia Madni and others, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩

৭. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ অনুদিত, মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশতা বিরচিত *ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস*, ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, জানুয়ারী-২০২১ পৃ. ১৮৭

৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪২

৯. আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৫

এ ক্ষেত্রে সুলতান ও বিচার প্রশাসন সর্বদা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছে। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "সুলতানের বিচারকার্য এতটা ভীতির সঞ্চার করে যে, সাম্রাজ্যের দূর দূরাঞ্চলেও মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।[১০] অপরাধীদের দমন করে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯০-১৫১৯ খ্রিঃ) নিরীহ জনগণের নিরাপত্তা ও শান্তিতে বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি করেন।[১১]

সুলতানী শাসনামলের বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুর্নীতিবাজ কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেন। অসাধু, ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের বিচারের মাধ্যমে রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি দূর করার জন্য কার্যকর বিচারিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ফলে সুলতানী শাসনামলে দুর্নীতির অপরাধে জড়িত থাকতে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সাহস পেতো না। তখন ঘুষ-দুর্নীতির অপরাধ অনেকটা হ্রাস পায়। বাংলার সুলতানগণ সর্বদা হিসাব-নিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং দুর্নীতি বাজদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। সাম্রাজ্যে অসাধু ব্যবসায়ীরা পণ্যের সঠিক মাপ না দিয়ে জনগণের সাথে প্রতারণাপূর্বক ওজনে কম দেয়া জনিত অপরাধে জড়িত থাকলে সুলতান ব্যবসায়ীদের বিচারের আওতায় আনেন। জড়িত ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তি ঘোষণা ও প্রয়োগ করায় পণ্যের ওজনে কম দেয়ার অপরাধ লক্ষ্যজনকভাবে কমে যায়। দোকানদারদের মাপের স্বল্পতা রোধ করার জন্য মাপের অসম্পূর্ণ অংশ তাদের গায়ের মাংস হতে কেটে নেয়া হতো। রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো। সুলতানগণ বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তি প্রদান করতে ইতস্তবোধ বা দয়া দেখাতো না। এ ক্ষেত্রে সুলতান ও বিচার প্রশাসন রাজদ্রোহীদের শাস্তি প্রদানে কোন আপোষ করতো না। ফলে রাজ্যে বিদ্রোহ করার অপরাধ করতে কেউ সাহস পেতো না। রাজ্যের জনগণের শান্তি-শৃঙ্খলা ও জানমাল রক্ষার জন্য সুলতানি বাংলার বিচার বিভাগ বিদ্রোহীদের প্রতিহিংসাপরায়ণ শাস্তির আওতায় নিয়ে এসে সর্বোচ্চ সাজা কার্যকর করতেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪১০ খ্রিঃ) সিংহাসনে আরোহণ করে প্রথমেই বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃবৃন্দের চক্ষুঃ উৎপাটন করে-

---

১০. মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১

১১. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৭

তাদের মাতার নিকটে প্রেরণ করলেন।[১২] কিন্তু বুকাননের বিবরণীর মতে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ তাঁর ভাইদের অন্ধ করেননি, বধ করেছিলেন; এতে লেখা আছে, "Ghyashuddin, on succeeding to government, put seventeen brothers to death".[১৩] যাইহোক, বিদ্রোহীদের পরিণতি হত ভয়াবহ।

অন্যদিকে বিচারিক আইন ও শাস্তি প্রয়োগের ফলে রাজ্য হতে জুয়াখেলা, বেশ্যাবৃত্তি, অশালীন আচরণ, অবৈধ বিবাহ, নৈতিক অবক্ষয় জনিত শরিয়ত ও আইন বিরোধী অপরাধজনক কর্মকাণ্ড দৃশ্যমান হারে নির্মূল হয়। বাংলার সুলতানী শাসনামলে বিচার বিভাগের প্রভাব ও ভূমিকার ফলে সাম্রাজ্যে জনগণ শান্তি ও স্বস্থিতে বসবাস করতে পেরেছিল। তৎকালীন সময়ে বাংলায় একটি অরাজকতা মুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সুলতানগণের আন্তরিকতা, অপরাধীদের দমনে দৃঢ়তা ও বিচার বিভাগের শক্ত অবস্থান ইত্যাদির কারণে বাংলার সুলতানী শাসনামলে জনগণ নিশ্চিন্তে, নিরাপদে ও ভীতিমুক্ত পরিবেশে বসবাস করেন। অভ্যন্তরীন শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে হুসেন শাহ রাজ্যসীমা সম্প্রসারণে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছিল।[১৪] বাংলার সুলতানগণের আবিস্কৃত মুদ্রা, শিলালিপি এবং সমসাময়িক কালে রচিত ইতিহাসগ্রন্থ পাঠ করে ধারণা হয়, বাংলার সুলতানি আমলের বিচার ব্যবস্থায় শরিয়তের আইন প্রয়োগ করা হতো এবং এর মূল লক্ষ্য ছিল সমাজে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা।[১৫]

---

১২. শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

১৩. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

১৪. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫

১৫. প্রফেসর মোঃ আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

খ. বাংলার বিচার ব্যবস্থার মূল্যায়ন

বাংলার সুলতানী শাসনামলের বিচার প্রশাসন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে দিল্লী ও বাংলার বিচার ব্যবস্থা সমানুপাতিক ভাবে বর্ণনা করা প্রয়োজন। সামগ্রিক সুলতানী বিচার প্রশাসন মূলত তাদের উত্তরাধীকার সুত্রে প্রাপ্ত মুসলিম বিচার ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। সুলতানী শাসনামল ইসলামী আইন বিশেষতঃ কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। বাগদাদের আব্বাসি খলিফাদের, স্পেনের উম্মাইয়া খলিফাদের ও মিশরের ফাতেমি খলিফাদের শাসন ও বিচার ব্যবস্থার অনুকরণে ভারতের মুসলিম সুলতানগণ এ দেশে ইসলামী শাসন ও বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল।[১] সুলতানী শাসন ব্যবস্থা শরিয়ত আইন দ্বারা পরিচালিত হতো। বাংলার সুলতানদের আবিষ্কৃত মুদ্রা, শিলালিপি এবং সমসাময়িক কালে রচিত ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করে ধারণা হয়, সুলতানী আমলের বিচার ব্যবস্থায় শরীয়তের আইন প্রয়োগ করা হতো এবং এর মূল লক্ষ্য ছিল সমাজে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা।[২] অন্যদিকে ড. শ্রীবাস্তব, ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রমূখ আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে, সুলতানদের শাসন ছিল ধর্মাশ্রয়ী।[৩] স্পষ্টত বুঝা যায় সুলতানী শাসনামলে বিচার ব্যবস্থা ইসলামী আইন দ্বারা পরিচালিত হতো। এক্ষেত্রে প্রশ্ন দাড়ায় মুসলিম ও অমুসলিমদের বিচার ব্যবস্থার স্বরূপ কেমন ছিল। বাংলার সুলতানী প্রশাসনে বিচার ব্যবস্থায় মুসলিমদের জন্য সর্বত্র শরয়ী আইন প্রয়োগ করা হতো। অন্যদিকে হিন্দু বা অমুসলিমদের বিচারে তাদের রেওয়াজ মাফিক আইন ও ধর্মশাস্ত্র মতে বিচার করা হতো। কোথাও কোথাও অমুসলিমদের বিচারের ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত আইন ও স্থানীয় সামাজিক প্রথা অনুসরণ করে বিচারিক কাজ করা হতো।

আরো উল্লেখ্য যে, অমুসলিমদের বিচার শরয়ী আদালতে করা হতো না। তাদের জন্য পৃথক আদালত গঠন করা হতো। ধর্মীয় বিধি-বিধান ও সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি মতে অমুসলমান অপরাধীদের অমুসলমান-

তথ্যসূত্রঃ

---

১. কাজী এবাদুল হক, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি ২০২১, পৃ. ১৪৭

২. প্রফেসর মোঃ আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

৩. এ. কে. এম শাহনাওয়াজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪

আদালতে বিচার করা হতো। দেওয়ানী মামলা অমুসলমান আদালতে বিচার নিষ্পত্তি করা হলেও ফৌজদারী অপরাধের বিচার *কাজী*র আদালতে সম্পন্ন করা হতো।

রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি হলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তা সকলের উপর প্রযোজ্য ছিল। সুলতানী শাসনামলে কেন্দ্রীয় প্রশাসন চারটি দফতরের উপর ন্যাস্ত ছিল। তন্মধ্যে অন্যতম দফতর ছিল *দীওয়ান-ই-রিসালাত* ও *দীওয়ান-ই-কাঁযা* (ধর্ম ও বিচার সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়)। এই ধর্ম ও বিচার মন্ত্রণালয়ের অধীন দিল্লী ও বাংলার সুলতানী শাসনামলের বিচার বিভাগ গঠিত হয়। ধর্ম ও বিচার মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলার স্বাধীন সুলতানী বিচার প্রশাসন পরিচালনা করা হতো। সুলতানী বিচার প্রশাসনে প্রকৃতপক্ষে ৫ (পাঁচ) ধরনের আদালত বিদ্যমান ছিল। কেন্দ্রীয় রাজধানীর আদালত, প্রাদেশিক আদালত, জেলা আদালত, পরগণার আদালত ও গ্রাম আদালত সমূহ তাদের নির্ধারিত এখতিয়ারাধীন আঞ্চলিক ও আর্থিক সীমা এবং অপরাধের প্রকৃতি অনুসারে স্ব-স্ব আদালত তাদের উপর ন্যস্ত মামলার বিচার পরিচালনা করতো। রাজধানী থেকে গ্রাম পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের আদালত মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মতে তাদের বিচারিক কাজ সম্পন্ন করতেন। মামলা গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এখতিয়ার নির্ধারিত ছিল।

আদালত সমূহ এখতিয়ারের দিক থেকে দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। ফৌজদারী ও দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা পৃথক আদালতে বিচার হতো। সমগ্র বিচার ব্যবস্থা দেওয়ানী ও ফৌজদারী দু'ভাগে ভাগ করে সুবিন্যস্তভাবে *কাজী*রা বিচার প্রার্থীর কাছ থেকে আবেদন গ্রহণ করতেন। বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য সুলতান নিজে শাহী আদালতে আসন গ্রহণ করতেন। সুলতান সরাসরি প্রজাদের অভিযোগ শুনতেন। বাংলার সুলতান বিচারিক কাজ পরিচালনার জন্য মনিমুক্তাখচিত সিংহাসনে সুরক্ষিত ও সৈন্য দ্বারা নিরাপত্তা পরিবেষ্টিত হয়ে আসীন হতেন। কথিত আছে সুলতান প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বিচার প্রার্থীর অভাব অভিযোগ শ্রবণ করতেন। বর্ণনায় স্পষ্ঠ পরিলক্ষিত হয় যে, সুলতান তাঁর দেহরক্ষী ও রাজকর্মচারীদের দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হয়ে স্বর্ণখচিত উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন।[৪] তিনি সুলতান উচ্চ পদস্থ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও দেহরক্ষী নিয়ে আদালতে বসতেন।[৫]

---

৪. এ. কে. এম আবদুল আলীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

৫. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯

এসময় *দবির* (সেক্রেটারি) ব্যতীত কারও কাছে অস্ত্র তো দূরের কথা, চাকু নিয়ে প্রবেশের অনুমতিও নেই।[৬] *কাজী*গণ তাদের নির্দিষ্ট আদালতে বিচার কাজ নিষ্পত্তি করার জন্য সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে বসতেন।

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় মামলা দায়ের করতে হলে বাদী বা ফরিয়াদীকে লিখিত বা মৌখিকভাবে উপযুক্ত আদালতে মামলা রুজু করতে হতো। তেমনিভাবে বাংলার সুলতানী শাসনামলে বিচারপ্রার্থীকে নিজে বা অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে দেওয়ানী মামলার আর্জি (Plain) এবং ফৌজদারী মামলার অভিযোগ (Complain) এখতিয়ারাধীন আদালতে দায়ের করতে হতো। দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে বিরোধীয় সম্পত্তির তফশীল, চৌহদ্দি এবং সমর্থন যোগ্য দলিলের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হতো। বিবাদীর পূর্ণাঙ্গ নাম, পিতার নাম, ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হতো। বিচারক মামলার গুণাগুণ (Merit) বিশ্লেষণ করে বিবাদীর প্রতি সমন বা নোটিশ ইস্যু করতেন। বিবাদী বাদীর দাবী মেনে নিলে সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে *কাজী* উক্ত মামলা নিষ্পত্তি করতেন। ফৌজদারী মামলায় বিচারক প্রাথমিক উপাদানের ভিত্তিতে অপরাধের তারতম্য অনুসারে অপরাধীদের নোটিশ (Summon) বা ক্ষেত্রমতে গ্রেফতারী পরোয়ানা (Warrent of Arrest) জারী করার নির্দেশ দিতেন।

মামলা দায়েরকারীকে তার দাবীর স্বপক্ষে আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে হতো। বিচার প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বিরোধীয় বিষয়ের সাক্ষী। মামলার বিষয়বস্তুর সত্যতা নিরূপণের জন্য সাক্ষী ছিল অপরিহার্য। সাক্ষীর সংখ্যা আদলত নির্ধারণ করতেন। সাক্ষীদের মুসলিম ও নিরপেক্ষ হতে হতো। মহিলারাও সাক্ষী হিসাবে জবানবন্দি (Statement) দিতে পারতেন। সাধারণত নুন্যতম দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্য মামলার ঘটনা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ঠ ছিল। সাক্ষীর ক্ষেত্রে শোনা (Hearsy) সাক্ষীর চেয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষীর (Eye Witness) জবানবন্দী অগ্রাধিকার দেয়া হতো। মৌখিক সাক্ষ্য আদালত গ্রহণ ও পছন্দ করতেন। বিশেষ মামলায় বিশেষজ্ঞের মতামত নেয় হতো। কমিশনে সাক্ষ্য গ্রহণের প্রচলনও বাংলার বিচার ব্যবস্থায় লক্ষ্য করা যায়।

---

[৬] মামুনুর রশিদ নদভী (অনূদিত), *সালতানাতে হিন্দ*, ঢাকা, হেরার জ্যোতি প্রকাশন ২০২৩, পৃ. ৬০

মামলার বাদী বা ফরিয়াদী পক্ষের নিকট আত্মীয়ের প্রদত্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করা হতো না। দণ্ডপ্রাপ্ত, অভ্যাসগত অপরাধী, মিথ্যাবাদী এবং পূর্বে আদালত কর্তৃক অযোগ্য ঘোষিত ব্যক্তিদের সাক্ষ্য আদালত গ্রহণ করতেন না। শিশু, বোকা, মিথ্যুক, দুর্দান্ত অপরাধী, মাতাল জুয়াড়ি, পাখি শিকারী, পেশায় শোককারী বা গায়কদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ছিল না।[৭] দ্রষ্টব্য বিষয়ে অন্ধ সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ছিল না।[৮] দোষী ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা আদালতে তার বিচার হতো এবং বিচারক নির্ভীকভাবে এবং কোন প্রকার প্রভাব ব্যতিরেকে বিচারের রায় দিতেন।[৯]

মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হতো। যারা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেছে বলে প্রমাণিত হতো তাদের কঠোর দণ্ড প্রদান করা হতো। উল্লেখ্য যে, সুলতান সিকান্দর লোদীর সময় গোয়ালিয়র দূর্গ হতে লুণ্ঠিত *রুবী* বা পদ্মরাগমণির বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাদের সুলতান শাস্তি প্রদান করেছিলেন।

বাদী কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার বিষয়বস্তুর সত্যতা যাচাই করার লক্ষ্যে তদন্ত করা হতো। ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটনের জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করে সুলতান বা কাজী ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের শনাক্ত করতেন। রাজ্যের সকল জেলা ও শহরে এমনকি বিচারিক বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য গুপ্তচরপ্রথা সুলতানী বাংলার বিচার প্রশাসনে প্রচলিত ছিল। গুপ্তচরকে *বারিদ* বলা হতো। একদা বাংলার সুলতান সিকান্দর শাহের (১৩৫৮-১৩৮৯ খ্রিঃ) বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করলে তিনি অপরাধীদের সরাসরি শাস্তির আওতায় না এনে তাদের অপপ্রচারের বিষয়টি অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা জানান। অন্যদিকে মামলার গুরুত্ব বিবেচনায় আদালত মামলার ঘটনা ব্যক্তিগত ভাবে তদন্ত করতেন। মামলার আলামত ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বস্তু উদ্ধার করতে আদালত নির্দেশ দিতেন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মামলার আলামত একটি গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হেতু কাজী নিজে বা অন্য মাধ্যমে ঘটনার আলামত উদ্ধার ও তল্লাশী (Search) কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। Police Officers or even the Qazi could search the house or person of the suspect.[১০]

---

[৭] কাজী এবাদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮

[৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮

[৯] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯

[১০] Attia Madni and others, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় কোর্ট ফি বা আদালতে মামলা দায়েরে প্রার্থীকের খরচ প্রদানের প্রচলন ছিল না। জনগণ ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা পেতে আইনগত হকদার ছিল। বাংলার বিচার ব্যবস্থায় সুলতান রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে বিচারের দায়িত্ব আল্লাহ প্রদত্ত তাদের উপর মহান দায়িত্ব বলে মনে করতেন।

সুলতানগণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ও জনগণকে ন্যায়বিচার পাইয়ে দেয়া বা নিশ্চিত করা আল্লাহর নির্দেশ হিসেবে মনে করতেন। তাই তাঁরা (সুলতান) বিনা পয়সা বা কোর্ট ফিতে জনগণকে বিচার পাইয়ে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে বিচারের যাবতীয় খরচ বহন করা হতো। ফলে ফরিয়াদি বা বাদী বা যে কোন পক্ষকে মামলার আর্জি, জবাব ও দরখাস্ত ইত্যাদি দাখিল করার সময় কোন কোর্ট ফি বা স্ট্যাম্প প্রদান করতে হতো না। এক কথায় বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসনামলে বিচার প্রার্থীরা বিনা পয়সায় বিচারের ফল উপভোগ করতেন। উল্লেখ্য যে, মামলার বাদী বিচারে রায় ও ডিক্রি পেয়ে বিজয় লাভ করলে তার উদ্ধারকৃত সম্পত্তির একাংশ তাকে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হতো বলে জানা যায়।

মামলার বিচার (Trial) প্রক্রিয়ায় ঘটনার সত্যতা নিরূপনের লক্ষ্যে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ, অপর পক্ষের জেরা, মামলার নথি ও পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করে কাজী উন্মোক্ত আদালতে মামলার রায়, ডিক্রি ও আদেশ প্রচার করতেন। ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে কাজী আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করলে সাজা ঘোষণা দিতেন এবং নির্দোষ প্রমাণ হলে মামলার অভিযোগ থেকে মুক্তি বা খালাসের নির্দেশ দিতেন। দেওয়ানী মামলার বিষয়ে বিচারক সম্পত্তি বা মামলার বিষয়বস্তু উদ্ধারের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। আদালতের আদেশ অমান্য কারীদের কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হতো।

বিচারাধীন মামলার বিষয় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (Alternative Dispute Resolution-ADR) মাধ্যমে সমাধান করার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। আদালতের বাইরে বিরোধীয় বিষয় নিষ্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের সম্মতিতে সালিশে বসতেন। বিচারকের মতো সালিশকারক বিরোধের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করে রোয়েদাদের মাধ্যমে উদ্ভুত বিষয় মীমাংসা করতেন। এ ক্ষেত্রে মীমাংসার শর্তাবলি উভয় পক্ষ মেনে চলতে বাধ্য ছিল।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আদালতের অনুমতি নিতে হতো। ফৌজদারী মামালায়ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান প্রচলিত ছিল। যদি রোয়েদাদ আইন বিরুদ্ধ না হতো তবে আদালত রোয়েদাদ অনুযায়ী ডিক্রি দিতেন।[১১]

বাংলার সুলতানী বিচার ব্যবস্থায় নিম্ন আদালতের প্রচারিত আদেশ, রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ উচ্চ আদালতে আপীল, রিভিশন, রিভিউ ও রেফারেন্স দায়ের করতে পারতেন।

নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত, দণ্ড, বা আদেশের নির্ভুলতা, বৈধতা বা যৌক্তিকতা এবং বিচারিক আদালতের কোন কার্যক্রমের নিয়মানুগতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হবার জন্য উচ্চ আদালত যে কোন মোকদ্দমার নথিপত্র (Records) তলব ও পরীক্ষা করতে পারতেন। এরূপ নথি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উচ্চ আদালত বিচারিক আদালতের সিদ্ধান্ত সংশোধন ও পরিমার্জন করতে পারতেন। Revision, reference and review were allowed and were in practice.[১২] তখন মামলার ঘটনা ও আইনের প্রশ্ন পুণর্বিবেচনা করে রায় দেয়া হতো।[১৩] কাজীর রায় পুনর্বিবেচনা করাকে *রুইয়াত* বলা হতো।[১৪] ন্যায়বিচারের স্বার্থে উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতে বিচারাধীন যে কোন মামলা এক আদালত হতে অন্য আদালতে স্থানান্তর করার আদেশ দিতেন। পক্ষদের আবেদনে বা সরকারের ইচ্ছায় এরূপ মামলা স্থানান্তর করা হতো। Only the King and the governor had the power to transfer the case from one court to another.[১৫] ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় মামলা দায়েরে সময়ের তামাদি গণনা করা হতো না। এর পরেও ঘটনার কারণ উদ্ভব হওয়ার পনের বৎসর পর মামলা দায়েরে আইনত বাধা ছিল। অন্যদিকে দেরিতে মামলা দায়েরে বাদী বা ফরিয়াদীর দাবী লোপ পেতো না। বাংলার মুসলিম শাসনামলে মামলা দায়েরে সময়সীমা বা তামাদিকাল গণনা করা হতো। বাংলার বিচার ব্যবস্থায়-

---

[১১] কাজী এবাদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩

[১২] Attia Madni and others, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩

[১৩] কাজী এবাদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২

[১৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২

[১৫] Attia Madni and others, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০

ফৌজদারী মামলায় সংক্ষিপ্ত বিচার (Summary trial) পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তুচ্ছ ও কম দণ্ডমূলক অপরাধের বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা হতো। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিশ ফৌজদারী অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিচার অনুষ্ঠানও করতেন।[১৬] সুলতানী বিচারিক আদালতে আসীন সুলতান, কাজী এবং বিচার প্রার্থীকে সহায়তা করার জন্য পেশাজীবী বিশেষত আইনে পারদর্শী উকিল, শরয়ী ব্যাখ্যাকারক মুফতি, উলেমা ও অমুসলিমদের ব্যক্তিগত আইনে বিজ্ঞ পণ্ডিত প্রমূখ ব্যক্তিদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মূখ্য ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। প্রধান বিচারপতি মুফতি (মুসলিম আইনবিশেষজ্ঞ), পণ্ডিত (হিন্দু আইন বিশেষজ্ঞ), *মুহতাসিব* (সরকার পক্ষের মামলা পরিচালনা কারী) ও *দাদবেকের* (আদালতের প্রশাসনিক কর্তা) সাহায্যে মামলার বিচার করতেন।[১৭] আলেম বা জ্ঞানীরা বিচার বিষয়ে কাজীদের সাহায্য করতেন।[১৮] এছাড়া আদালতের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য *আমির-ই-দাদ, নায়েবে দাদ, মুহতাসিব ও কোতোয়াল* উল্লেখযোগ্য কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। বাংলার বিচারিক আদালতে সংশ্লিষ্ট বিশেষ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ও ব্যক্তিদের বিবরণ উল্লেখ করা হলো-

উকিলঃ ইসলামী বিচার ব্যবস্থায় মামলার পক্ষগণ তাদের মামলা পরিচালনা ও দায়ের করার জন্য উকিল বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারতেন। আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তিরাই উকিল হিসাবে মামলায় পক্ষগণকে প্রতিনিধিত্ব করতেন। সুলতানী শাসনামলে মূলত উকিল বা আইনজীবীদের পেশা ও সংগঠনের উদ্ভব হয়। যা বাংলাদেশ শাসনামলেও এই পেশাজীবী সংগঠনের অস্তিত্ব দেখা যায়। তৎকালীন সময়ে আইনজীবীদের 'ভাকিল' হিসাবে ডাকা হতো। 'ভাকিল' শব্দ থেকে 'উকিল' শব্দটির উৎপত্তি।[১৯] সুলতানী বাংলার শাসনামলে বিচার প্রার্থী বা যে কোন পক্ষ ভাকিল নিয়োগ দিয়ে মামলা পরিচালনা করতে পারতেন। উকিল মূলত মক্কেলের নিকট হতে মামলার ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনে ও প্রাথমিক দলিল প্রমাণ-

---

১৬. লতিফুর রহমান ভাষান্তর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮

১৭. কাজী এবাদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯

১৮. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৫

১৯. আবদুস সালাম মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৫

বিশ্লেষণ করে সত্য ঘটনা উল্লেখ করে মামলা দায়ের করতেন। শুনানীর সময় উকিল আদালতে তার মক্কেলের পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতেন। পক্ষগণ নিজেরাও স্ব-স্ব মোকদ্দমা পরিচালনা করতে পারতেন। উকিল মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জেনে বুঝে মিথ্যা বক্তব্য পেশ করার নিয়ম ছিলনা। মিথ্যা মামলায় উৎসাহিত করে অন্যের আইনসংগত অধিকার খর্বকারী উকিল নিন্দনীয় ছিল।[২০] কোন পক্ষ উকিল নিয়োগ দিক বা না দিক রাষ্ট্রীয় খরচে আসামী বা অভিযুক্তের পক্ষে আইনজীবী নিয়োগ করা হতো। উকিলরা স্বাধীনভাবে তাদের পেশা চালিয়ে নিতে পারতেন। উকিল তাঁর ফিস বা সম্মানী মক্কেল থেকে আদায় করে নেয়ার প্রথা চালু ছিল।

মুফতিঃ- মুফতি মূলত কোর্টের সাথে সংযুক্ত আইন কর্মকর্তা ছিলেন। সুলতান প্রধান বিচার পতির সাথে আলোচনা করে ইসলামী আইন, নজির ও বিচার সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোককেই মুফতি হিসেবে নিয়োগ দিতেন। মুফতি কাজীর আদালতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। বাংলার বিচার ব্যবস্থায় মামলার কোন বিষয়ে জটিলতা দেখা দিলে কাজী মুফতির কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন। মুফতি কোন পক্ষকে সমর্থন না করে ন্যায়বিচারের স্বার্থে আইন সম্পর্কে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতেন। তাঁর আইনি মতামত ও পরামর্শ আদালত অনুসরণ করতেন। কোন কোন সময় তাঁর মতামত অগ্রাহ্য করা হতো। মুফতির প্রধান দায়িত্ব ছিল শরিয়তের সুষম ব্যাখ্যা দান এবং কাজীকে সাহায্য করা।

উলেমাঃ- বাংলার সুলতানী বিচার প্রশাসনে উলেমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সুলতান বিচার কাজে উলেমাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন। উলেমাগণ কাজীর বিচার কাজেও সাহায্য করতেন। মোকদ্দমার বিষয়বস্তুর উপর আইনগত ও ঘটনাগত প্রশ্ন উদ্ভব হলে আদালত উক্ত বিষয়ে উলেমাদের মতামত চাইতেন। অধিকাংশ উলেমাদের মতামতকে আদালত গ্রহণ করতেন।

পণ্ডিতঃ- হিন্দুদের বিচারিক বিষয়বস্তুর সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি করার জন্যে আদালত হিন্দু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিয়োগ দিতেন। দেওয়ানী প্রকৃতির মামলায় হিন্দুদের ব্যক্তিগত আইন সম্পর্কে পণ্ডিত আদালতকে সহযোগিতা করতেন। পণ্ডিত আইন জানা বিশেষজ্ঞ বা জুরিস্ট ছিলেন।

---

[২০] কাজী এবাদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫

আমির-ই-দাদঃ- বাংলার সুলতানী বিচার প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিচার সংক্রান্ত কর্মকর্তা ছিলেন *আমির-ই-দাদ*। তিনি *'দাদবেগ'* নামেও পরিচিত ছিলেন। কাজীর আদালতে প্রশাসনিক কাজে তাঁর যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। সুলতানের অনুপস্থিতিতে তিনি *মাজালিম* আদালতে বিচারের জন্য বসতেন। *আমির-ই-দাদের* বহুবিধ কাজের মধ্যে বিচারকের রায় কার্যকর করা ও বিচারকের রায়ে ভুল ত্রুটি থাকলে তা সংশ্লিষ্ট আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কাজীর দণ্ডাদেশ কার্যকর করা ছিল তাঁর দায়িত্বের অন্যতম। এছাড়াও তিনি রাজ্যে নির্মিত মসজিদ, মাজার, খানকা, লঙ্গরখানা, সেতু ও সরকারি দালান-কোঠার রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব পালন করতেন।

মুহতাসিবঃ- বাংলার বিচার ও মাঠ প্রশাসনে *মুহতাসিব* একজন দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যনিষ্ট রাজকর্মচারি ছিলেন। *মুহতাসিবের* দায়িত্ব ছিল অপরিসীম। তিনি অপরাধের অনুসন্ধান করা, আইনভঙ্গ ও নিয়ম লঙ্ঘন করাকে বাধা দান ইত্যাদি কাজ করতেন। সংক্ষিপ্ত বিচার ও সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া ঘটনা নিষ্পত্তি করাও তাঁর কর্তব্যের মধ্যে ছিল। তিনি শরিয়ত বিরোধী সকল প্রকার কার্যকলাপ নজরদারি করতেন। তাছাড়া মাদকদ্রব্য বিক্রি ও জুয়াখেলা বন্ধ করার জন্যে বেআইনী ব্যবসা ও নৈতিকতা বিরোধী কাজের তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে *মুহতাসিবদের* নিয়োগ করা হয়েছিল।[২১] He was also responsible for regulating the filing of plaints and appeals.[২২] ভেজাল খাদ্য বিক্রেতা, ত্রুটিপূর্ণ দাড়িপাল্লা ব্যবহারকারী ও ওজনে কম পণ্য প্রদান কারীদের *মুহতাসিব* কঠোর শাস্তি দিতেন। তিনি ভ্রাম্যমান আদালতের মত ঘটনাস্থলে সংক্ষিপ্ত ও তাৎক্ষণিক অপরাধীদের বিচার করে সাজা ও জেল বা আর্থিক জরিমানার আদেশ দিতেন। *মুহতাসিব*, *কাজী* ও পুলিশ অফিসারের মধ্যবর্তী কর্মকর্তা ছিলেন।

কোতোয়ালঃ- কোতোয়াল বাংলার বিচার ব্যবস্থার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন। সালতানাতের রাজ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সংহতি বজায় রাখার দায়িত্ব কোতোয়ালের। প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদ্বয় রায় চৌধুরী দত্ত ও মজুমদার তাদের লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ, "Advanced History of India" - তে বলেন যে, "*কোতোয়াল* শান্তি-

---

২১. কাজী এবাদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮
২২. Attia Madni and others, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮

ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী (Custodian of peace and order)।[২৩] *কোতোয়াল* শহরের প্রতিটি নাগরিকের তালিকা তৈরী করতেন এবং তাদের কার্যকলাপ নজরদারিতে রাখতেন। তিনি রাস্তা ঘাটে নিরাপত্তা বজায় রাখতেন। রাতের বেলা পাহারা দিতেন। এলাকায় যাতে চুরি, ডাকাতি, খুন খারাপী না হয় সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখতেন। এছাড়াও কোতোয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করতেন। বিশেষক্ষেত্রে ফৌজদারী অপরাধের বিচারও করতেন।

বাংলার সুলতানী শাসনামলে বিচারক (কাজী) এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্মচারীদের যথেষ্ট বেতন ভাতা ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হতো। নগদ মুদ্রার পরিবর্তে রাজস্ব অনুদানের মাধ্যমে বিচারকদের বেতন প্রদান করা হতো। ইবনে বতুতার মতে ১৩৩২ খ্রীঃ কাজীদের ১২,০০০/ (বার হাজার) দিনার বেতন দেয়া হতো। বেতনের পাশাপাশি আবাসিক সুযোগও বিচারকরা ভোগ করতেন। অন্তত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে এই বেতন নগদ অর্থের পরিবর্তে রাজস্ব অনুদানের মাধ্যমে প্রদত্ত হতো বলে মনে হয়।[২৪] বাংলার কাজীদেরও উচ্চমানের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হতো।

বাংলার বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। বিচার বিভাগসহ সকল সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তদন্ত করে দেখা হতো। দুর্নীতি ও অপরাধমূলক কাজে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। বদাউনের মতে, অদক্ষতা এবং দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেলে বাদশাহ এমনকি প্রধান বিচারপতিকেও বরখাস্ত করতেন বা পদাবনতি ঘটিয়ে অধস্তন কাজীর পদে নামিয়ে দিতেন।[২৫] অযোগ্য এবং দুর্নীতি পরায়ণ কাজীকে বরখাস্ত করা হতো এবং তিনি সমাজে ভয়ঙ্করভাবে নিন্দিত হতেন।[২৬] সুলতানী শাসনামলে দিল্লী ও বাংলার সুলতানগণ বিচার বিভাগের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। আপীলের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। সুলতান নিজেকে ন্যায়বিচারের-

---

[২৩] মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৩

[২৪] কাজী এবাদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০

[২৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১

[২৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১

ধারক বাহক বলে মনে করতেন। ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সুলতানের উপর আল্লাহর নির্দেশ বলে মনে করতেন। The Sultans considered it their primary duty to maintain justice.[২৭] কাজীরা যেসব ব্যাপারে ন্যায়বিচার করতে অসমর্থ হতেন সেসব ব্যাপারে সুলতান নিজেই বিচার করতেন।[২৮] সুলতান *সুলতান-উল-আদিল* (ন্যায়পরায়ণ রাজা) উপাধি গ্রহণ করে নিজেকে রাজ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে জাহির করতেন। কোন কোন মুদ্রায় সুলতান নিজেকে "ন্যায়বিচারক", "আল্লাহর পথে যোদ্ধা" এবং "ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যকারী" বলে দাবি করতেন।[২৯] বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ বিচার ও প্রশাসনিক অধিকার প্রতিষ্ঠায়, আইনবিশারদ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আবদুর রব সুলতানদের সম্পর্কে চমৎকারভাবে বলেন, "সুলতান ঘটনাবলি নিয়ন্ত্রণ করেন, অধিকার বজায় রাখেন, অপরাধমূলক আইন প্রয়োগ করেন; সুলতান ছিলেন ধ্রুব নক্ষত্র, তাঁর চারদিক ঘিরে রাজ্যের ঘটনাবলি সংঘটিত হয়; তাঁর রাজ্যে তিনি সৃষ্টিকর্তার আশ্রয়ের প্রতিরূপ; তাঁর উপর সৃষ্টিকর্তার ছত্রছায়া বিস্তারিত; তিনি নিষিদ্ধকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন, উৎপীড়িতদের সাহায্য করেন, অত্যাচারিকে নির্মূল করেন এবং ভীরুদের নিরাপত্তা বিধান করেন।[৩০] সুলতান ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ও জনগণের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করে তড়িৎ সমাধান করাকে পবিত্র দায়িত্ব মনে করতেন। উল্লেখ আছে যে, সুলতান জনসাধারণের ফরিয়াদ বা নালিশ শুনার জন্য তাঁর প্রাসাদে একটি শিকলে বাধা ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখতেন যেন অভিযোগকারী অনায়াসে উক্ত ঘণ্টা বাজিয়ে সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। বিচার বিভাগ সুলতান সুবিন্যস্ত রাখতেন।

বাংলার বিচার ব্যবস্থায় সুলতানের গুরুত্ব ছিল সর্বোচ্চ। দিল্লী ও বাংলার সুলতানগণের শাসনকালে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় যে চৌম্বকীয় ঘটনা ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সুলতানী বিচার ব্যবস্থার একটি চমৎকার ধারণা দেয়। সুলতানী বিচার প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি বর্ণনা করা আবশ্যক। সুলতান ইলতুৎমিশ (১২১১-১২৩৬ খ্রিঃ) দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

---

[২৭] Ishtiaq Husain Qureshi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২

[২৮] আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৫

[২৯] আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪

[৩০] প্রফেসর মো. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

তাঁর ন্যায়বিচার সম্পর্কে বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা বলেন, "ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অভিযোগ শ্রবণের জন্য ইলতুৎমিশ দরবারে একটি শিকল বাঁধা ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখতেন"। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ এটা বাজিয়ে ন্যায়বিচারের জন্য সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত"।[৩১] মধ্যযুগের ইতিহাসে সুলতানা রাজিয়ার শাসনকাল এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে নারীর সিংহাসনে আরোহণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অদ্ভুত ও আলৌকিক ঘটনা। তাঁর ন্যায়বিচার সম্পর্কে ইতিহাসে সমৃদ্ধি ও সুখ্যাতি রয়েছে। ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ বলেন, "তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সুলতানা, বুদ্ধিমতি, ন্যায়বতী, মহানুভবা, বিদ্যুৎসাহিনী, সুবিচারক, প্রজাগণের রক্ষাকর্ত্রী, সামরিক প্রতিভা সম্পন্না এবং রাজাদের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার গুণাবলী ও যোগ্যতার অধিকারিনী।[৩২] সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০খ্রিঃ) সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। দিল্লীর সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবন (১২৬৬-১২৮৭খিঃ) তাঁর রাজ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক ছিলেন। তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য মামলার ঘটনা সম্পর্কে বিশ্বস্ত গোয়েন্দাদের মাধ্যমে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতেন। তিনি দক্ষতার সাথে তাঁর শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. ত্রিপাঠী বলেন, "তাঁর শাসন নীতি শক্তি, সম্মান ও সুবিচারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।"[৩৩] বিচারকার্য পরিচালনার জন্য তিনি তাঁর আত্মীয় স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেননি এবং তাঁর কোন আত্মীয় অথবা সহচর অন্যায় কাজ করলে এর প্রতিকার করতে দ্বিধা করতেন না।[৩৪] বলবন তাঁর শাসনামলে নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১খ্রিঃ) একজন নম্র ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন লোক ছিলেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁর দয়া ও উদারতার জন্য কিংবদন্তীতে পরিণত হয়ে আছেন। বিচারের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। সুলতান নিজে বিবাদী হিসেবে কাজীর বিচারালয়ে-

---

৩১. মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০

৩২.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬

৩৩.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২

৩৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২

উপস্থিত হন। কাজীর রায় তিনি সর্বদা শিরোধার্য করে নেন। দিল্লীর অন্যতম শাসক সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রিঃ) একজন জনহিতৈষী শাসক ছিলেন। সুলতানী বিচার বিভাগে সংস্কারের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি কঠোর শাস্তি দানের বিরোধী ছিলেন। অপরাধীকে শাস্তি দানে শিথিলতা প্রদর্শন করেন। পীড়ন প্রথার উচ্ছেদ, মোকদ্দমার নিয়মাবলি সংক্ষিপ্তকরণ এবং গুপ্তচর প্রথা রহিত করার ন্যায় বিভিন্ন বিচার বিভাগীয় সংস্কারের মাধ্যমে তাঁর দয়া প্রকাশ পায়।[৩৫] বাংলার স্বাধীন সুলতানদের বিচার ব্যবস্থা ছিল বিশ্ব নন্দিত। ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলার সুলতানগণ জগৎ প্রশংসিত। সুলতানী বাংলায় জনগণ ন্যায়বিচারের সুফল ভোগ করেছে। বাংলার বিচার প্রশাসন মূল্যায়নে সুলতানগণের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ভূমিকা আলোচনা করা যায়। বাংলার স্বাধীন সুলতানগণের মধ্যে সেকান্দর শাহের (১৩৫৮-১৩৮৯ খ্রিঃ) শাসনামলে প্রজাগণ নির্ভয় ও সুখে জীবন যাপন করতেন। সুলতান সামস্উদ্দীন ইউসুফ শাহ ১৪৭৪-১৪৮১ খ্রিঃ) পরলোক গমন করার তৃতীয় দিবসে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সেকান্দর শাহ (১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে) অমাত্য ও সেনাপতি বৃন্দের সম্মতিক্রমে বাংলার সিংহাসনে উপবেশন করলেন; এবং দয়া ও ন্যায়পরতার সাথে রাজ্যশাসন আরম্ভ করে প্রজারঞ্জন করতে লাগলেন।[৩৬] বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে যিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও কাজীর আদালতের কাঠগড়ায় দাড়িয়ে কাজীর আদেশ মেনে নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তিনি হলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪১০ খিঃ)। তিনি একজন সুশাসক ও ন্যায়পরায়ণ সুলতান ছিলেন। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে *রিয়াজ-উস-সালাতিন* এ একটি কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। কাহিনীটি সর্বজনবিদিত। উক্ত কাহিনীটি শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত ও গোলাম হুসেন সলীম বিরচিত *রিয়াজ-উস-সালাতিন* থেকে অবিকল তুলে ধরা হল; “একদা

সুলতান গিয়াসউদ্দীন তীর চালনা করতে করতে এক বিধবার পুত্রের শরীর বিদ্ধ করেন। বিধবা তথাকার কাজি সিরাজউদ্দীনের নিকট উপনীত হয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেছিলেন। কাজি সাহেব চিন্তা করতে লাগলেন, যদি সুলতানের মনোরক্ষা করি তবে ঈশ্বরের নিকট দণ্ডনীয় হব; আর তা না করলে সুলতানকে তলব

---

[৩৫] ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

[৩৬] শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

করাও কঠিন ব্যাপার। যাইহোক, কাজি সাহেব অনেক চিন্তার পর সুলতানকে বিচারালয়ে উপস্থিত হবার জন্য আদেশ পত্র সহ *বরকন্দাজ* প্রেরণ করলেন। তারপর কাজি সাহেব একগাছি কোড়া শয্যাতলে রেখে বিচারাসনে উপবেশন করলেন। সুচতুর *বরকন্দাজ* সুলতানের হস্তে আদেশপত্র প্রদান করা দু:সাধ্য দেখে আজান দিতে শুরু করল। সুলতান অসময়ে আজানধ্বনি শুনে আজানদাতাকে ধৃত করে দরবারে আনার জন্য প্রহরীদেরকে আদেশ দিলেন। রাজাজ্ঞা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হল। সুলতান অসময়ে আজানধ্বনির কারণ জিজ্ঞাসা করলে *বরকন্দাজ* উত্তর করল, 'সুলতান, *কাজী* সাহেব আপনাকে বিচারালয়ে উপস্থিত করার জন্য আদেশ পত্র প্রেরণ করেছেন। কিন্তু রাজ দরবারে প্রবেশ করা দুষ্কর বিধায় আমি এই কৌশল অবলম্বন করেছি। এই আদেশ পত্র গ্রহণ করুন। আমার সঙ্গে বিচারালয়ে গমন করুন। কারণ, আপনি বিধবাপুত্রের শরীর তীরবিদ্ধ করেছেন। এজন্য বিধবা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেছে।' সুলতান কাজী সাহেবের আদেশপত্র প্রাপ্তিমাত্র দণ্ডায়মান হলেন এবং কুক্ষিতলে একখানি তরবারী লুকায়িত করে বিচারালয়ে উপনীত হলেন। কাজি সুলতানকে কোন প্রকার অভ্যর্থনা না করে তাঁকে বললেন,"আপনি এই প্রাচীনা বিধবাকে সন্তুষ্ট করুন।" সুলতান বিধবাকে সন্তুষ্ট করে কাজীকে বললেন, " কাজী সাহেব, বিধবা সন্তুষ্ট হয়েছে।" কাজী বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ?" বিধবা প্রত্যুত্তরে তার সম্মতি জ্ঞাপন করল। কাজী সাহেব তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হয়ে সুলতানকে বহু সমাদরে স্বীয় আসনোপরি উপবেশন করালেন। সুলতান কুক্ষিতল হতে তরবারি বের করে কাজীকে সম্বোধনপূর্বক বললেন, আমি শাস্ত্রের আদেশ অনুসারে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। যদি আপনি শাস্ত্রানুমোদিত বিচারকার্য্য নির্বাহ করতে একতিলও বিচলিত হতেন, তবে আপনাকে আমি এই তরবারী দ্বারা দ্বিখণ্ড করতাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সমস্ত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। কাজী সাহেবও শয্যাতল হতে কোড়া বের করে বললেন, যদি আপনি শাস্ত্রের আদেশ পালন করতে বিমূখ হতেন, তবে এই কোড়ার আঘাতে আপনার পৃষ্ঠদেশ রক্তাক্ত করতাম। অদ্য বিপদ উপস্থিত হয়েছিল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ বিপদ কেটে গেল। সুলতান গিয়াসউদ্দিন কাজী সাহেবের বিচারে প্রীতি লাভ করলেন; এবং তাকে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করে স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন।" ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৩৭-১৪৫৯ খ্রিঃ) পঞ্চদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকেই সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন বলে ধরণা করা হয়। নাসির শাহ একজন ন্যায়বিচারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত

হন। *রিয়াজ* এ নাসিরুদ্দীন সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে, "নাসির শাহ সমস্ত কাজ ন্যায়পরায়ণতা এবং উদারতার সঙ্গে করতেন। যার ফলে বৃদ্ধ-যুবা নির্বিশেষে সমস্ত লোক তৃপ্ত হল এবং আহ্‌মদ শাহের অত্যাচার জনিত ক্ষত শুকিয়ে গেল। এই মহান রাজা গৌড়ের দূর্গ ও প্রাসাদগুলো নির্মাণ করেন।[৩৭] বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিঃ) সর্বকালের নরপতিদের মধ্যে তাঁর একটি বিশেষ স্থান আছে বলে সর্বজন স্বীকৃত। তিনি অসম্প্রদায়িক মনোভাবের একজন রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন। তাঁর বিচারিক আদালতে মুসলিম-অমুসলিম ভেদে অপরাধীকে শাস্তি দেবার সময় পক্ষপাতিত্ব করেননি। তাঁর শাসনামলে মুসলমান সাধু ও ধর্মগুরুরাও কোন অন্যায় কাজ করলে সুলতান তাঁদের শাস্তি দিতে দ্বিধা করতেন না। রুকনুদ্দীন বারবক শাহের ত্রিবেণী (হুগলি) শিলালিপিতে (৬৮০হি./১৪৫৫খ্রিঃ) তাঁকে 'ন্যায়বিচারক, উদার প্রকৃতির, বিদ্বান এবং আদর্শ চরিত্র' (The just, the generous, the learned, the perfect) মালিকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৮] রুকনুদ্দীন বারবক শাহের পুত্র বাংলার স্বাধীন সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ। তিনি (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রিঃ) প্রায় ৭ বছর রাজত্ব করেন। তিনি স্থির প্রকৃতি, দয়ালু, ধর্মপরায়ণ, বিদ্বান ও সাধু ছিলেন।[৩৯] *তবকাত-ই-আকবরি*'র ভাষায়, তিনি ছিলেন ধৈর্য্যশীল, প্রজাহিতৈষী ও ধর্মনিষ্ট বাদশা।[৪০] মাঝে মধ্যে তিনি প্রধান প্রধান আলেমদের তাঁর সভায় ডেকে বলতেন, 'তোমরা ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে গিয়ে কারও পক্ষ অবলম্বন করবেনা; করলে তোমাদের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক থাকবে না এবং আমি তোমাদের শাস্তি দেব।[৪১] বুকাননের বিবরণীতে ইউসুফ শাহকে "a very learned prince" বলা হয়েছে।[৪২] তিনি ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করতেন। তাঁর শাসনামলে কেউ মদ্যপান করতে সাহস পেতো না।

---

৩৭. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯

৩৮. প্রফেসর মোঃ আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

৩৯. শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫

৪০. প্রফেসর মোঃ আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

৪১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

৪২. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২২

তিনি নিজে বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাই যে সমস্ত মামলায় কাজীরা ব্যর্থ হতো, তাদের অধিকাংশেরই তিনি নিজে নিস্পত্তি করতেন।[৪৩] বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে প্রশংসিত ও সমালোচিত রাজা ছিলেন জালালউদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪১৮-১৪৩১ খ্রিঃ)। তার পূর্ব নাম ছিল যদু। মূলত তিনি রাজ্য শাসন করার জন্যে ধর্মান্তরিত হন বলেও মত পাওয়া যায়। জালালউদ্দীনের শাসনামলে প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি নানান উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রজাগণ সুখে ও স্বাচ্ছন্দে কালাতিপাত করেছিলেন। এতে বুঝা যায় তাঁর শাসনামলে আইন-শৃঙ্খলা যথেষ্ঠ উন্নত ছিল। বাংলার সুলতান নাছিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৪৩৭-১৪৫৯ খ্রিঃ) শাসনকাল সর্বব্যাপী প্রশংসিত ছিল। তাঁর শাসনকালে রাজ্যের সকল প্রজা সন্তুষ্ট ছিল। নাছির শাহ ন্যায়বিচার ও দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে সঙ্কল্পারূঢ় ছিলেন।[৪৪] জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ (১৪৮১-১৪৮৬ খ্রিঃ) একজন উদার ও দায়িত্বশীল সুলতান ছিলেন। তিনি সকলের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করতেন। তাঁর শাসনকালে জনসাধারণ সুখৈশ্বর্য্যে বসবাস করতেন। তিনি অত্যন্ত সুবিবেচক, ন্যায়পরায়ণ ও বুদ্ধিমান শাসনকর্তা ছিলেন। *রিয়াজ* এ অধিকন্তু লেখা আছে, "প্রজাদের সম্পর্কে তিনি উদারনীতি অনুসরণ করে চলতেন।[৪৫] বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯০-১৫১৯ খ্রিঃ)। তাঁর শাসনকাল নিয়ে সর্বমহলে প্রশংসা রয়েছে। ব্লকম্যান লিখেছেন, "The name of Husain Shah, the good, is still remembered from the frontier of Orissa to the Brahmaputra".[৪৬] তিনি ৮৯৯ হিজরীতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সমসাময়িক পার্শ্ববর্তী দেশের রাজারা তাঁর নেতৃত্ব ও বাহুবলের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন। ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব রয়েছে। হোসেন শাহ একজন সুশাসক ছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী রাজাদের রাজত্বকালে যে সব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি তা দূর করে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

---

৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩

৪৪. শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫

৪৫. সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭

৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১

তাঁর রাজত্বকালে যদিও বেশির ভাগ সময় ভিন্ন দেশের সাথে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন তবুও দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার ব্যহত হয়নি। এটা ছিল তাঁর শাসন দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার উজ্জল দৃষ্টান্ত। তিনি অসম্প্রদায়িক চেতনার ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ধর্মের ক্ষেত্রে উদার প্রকৃতির ছিলেন। হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ও পক্ষপাতহীন আচরণ করার ক্ষেত্রে যত্নবান ছিলেন। ফলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা তাঁর পক্ষে সহজ ও সম্ভব হয়ে উঠে। ন্যায়বিচার, আইনের শাসন ও আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তিনি সফর করতেন। সুলতান হোসেন শাহ ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্ত হয়ে গৌড়ের নিকটবর্তী একডালার দূর্গে অবস্থান করতে লাগলেন।[৪৭] সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের জ্যেষ্ঠপুত্র নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহ (১৫১৫-১৫৩১খ্রিঃ) সদ্বিচারক ও বুদ্ধিমান ছিলেন; তাঁর রাজোচিত গুণগ্রাম ভ্রাতৃবর্গাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।[৪৮] তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন এবং তাঁর ভাইদের প্রতি তিনি সুবিচার করেন, যা সাধারণত ভারতের অন্যান্য সুলতানদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। *রিয়াজ* এ লেখা আছে অন্যান্য রাজাদের মতো নসরৎ শাহ তাঁর ভাইদের বন্দি করেননি, তার বদলে তাদের পিতৃদত্ত বৃত্তি দ্বিগুন করে দেন।[৪৯] বাংলার সুলতানদের একজন সাইফউদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৪৮৬-১৪৯০ খ্রিঃ) একজন মহৎ ও দয়ালু সুলতান ছিলেন। উদারতা ও মহত্বের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অসাধারণ। আইন-আদালতের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং তাঁর কাজগুলো ছিল মহৎ। বাংলার সুলতানগণ বিচার ব্যবস্থায় সংস্কারমূলক নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সুলতানী বিচার ব্যবস্থায় প্রাথমিককালে বর্বর ও নৃশংস শাস্তির বিধান ছিল। কোন কোন সুলতান কঠোর ও জঘন্য সাজার বিধান শিথিল করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক অপরাধীদের পুনর্বাসনে বিশ্বাসী ছিলেন। এজন্য তিনি “কর্মবিনিয়োগ সংস্থা (Employment Excange Bureau)” গঠন করেন।[৫০] তিনি অপরাধীর বিকলাঙ্গ করার প্রথা বাতিল করেন।

---

৪৭. শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

৪৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪

৪৯. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৭

৫০. মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৩

এছাড়াও বাংলার সুলতানী শাসন ব্যবস্থায় প্রচলিত অপরাধের সাজা যথাক্রমে হস্তপদাদি বিচ্ছেদ, চক্ষু উৎপাটন, পা, কান , নাক, কেটে নেয়া, গলায় গরম সীসা ঢেলে দেয়া, আগুনে নিক্ষেপ করা, হাত ও পায়ের শিরা কেটে দেয়া ও করাত দিয়ে দেহ বিচ্ছিন্ন করার মত জঘন্য ও মানবতাবিরোধী সাজা রহিত করা হয়। কল্যাণমুখী বিচার পদ্ধতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে অপরাধীদের শারিরীক নির্যাতনমূলক সাজা বন্ধ করে দেয়া হয়। সরকারীভাবে বেকার ও গরীবদের চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়। বাংলার সুলতানী বিচার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান ফৌজদারী অপরাধে দায়মুক্তি (Immunity/ Indemnity) সুবিধা পেতেন না। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি এবং বিচার বিভাগের কর্ণধার হয়েও সুলতান তাঁর কৃত অপরাধের জন্য বিচারকের (কাজী) দরবারে উপস্থিত হতে হতো। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় সোনারগাঁওয়ের কাজী সিরাজউদ্দীন সুলতানকে তাঁর আদালতে তলব করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ কাজীর আদালতে উপস্থিত হয়ে কাজীর রায় মেনে নিয়েছেন।

সুলতানী বাংলার বিচার প্রশাসন সম্পূর্ণ ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুলতানী বিচারে উঁচু-নিচু, ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদি ভেদে কোন তফাৎ ছিল না। সুলতান বা কাজী অন্যায়, হারাম তথা আইন বিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত কাউকেই ছাড় দিতেন না। বিচারে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি যত প্রভাবশালী হউক না কেন তাকে শাস্তি ভোগ করতেই হতো। বিচারক ধনী, দরিদ্র ও অভিজাতদের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না। আইনের চোখে সবাই সমান (Equality before Law) এই নীতি বাংলার সুলতানী বিচার ব্যবস্থায় দৃঢ়ভাবে পালন করা হতো। একবার একজন নিরপরাধ লোককে হত্যা করার জন্য তিনি (আহমদ শাহ ১৪১১-১৪৪২খ্রিঃ) তাঁর জামাতাকেও মৃত্যুদণ্ড দেন।[৫১] এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়, No government could, in the middle ages succeed completely in wiping out corruption and injustice, but the Sultanate provided a well-organized department of justice; by making all proceedings public and dividing responsibility and power among different officials, it established an effective system of checks and balance.[৫২]

---

[৫১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৩

[৫২] Ishtiaq Husain Qureshi, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২

বাংলার বিচার প্রশাসনে সুলতান ও কাজীদের অবদান যেমন স্মরণীয় ও প্রশংসিত তেমন সুলতানী বিচার ব্যবস্থার স্বরূপ পর্যালোচনা করলে সুলতান ও কাজীদের বিচারিক নৃশংসতা ও অবিচারের চিত্রও ফুটে উঠে। দিল্লী ও বাংলা উভয় রাজ্যের শাসকরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচারিক হত্যা (Judicial killing) ও নির্মমতার (Oppression) মত অন্যায় কাজও করেছে বলে জানা যায়। দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী (১২৯৬-১৩১৬খ্রি.) খুবই নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসা পরায়ণ শাসক ছিলেন।[৫৩] তিনি রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত কাউকে ছাড় দিতেন না। সুলতান শুধু দোষী মনে করার কারণে শত শত নিরপরাধ লোককে হত্যা করা হয়। ড. লাল মন্তব্য করেনঃ “জালালউদ্দীন, ইনাত খান, ওমর খান ও মঙ্গু খান এর হত্যা এবং উলুঘ খানকে গোপনে বিষপ্রয়োগ সুলতানের সম্পূর্ণ অমানবিক প্রকৃতির পরিচয় বহন করে।” [৫৪] অন্যদিকে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১খ্রি.) একজন ধার্মিক শাসক ছিলেন। তিনি নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন এবং নামাজে অবহেলা কারীদের শাস্তি প্রদান করতেন। তিনি সকল প্রকার অবৈধ ইন্দ্রিয় ভোগ, পাপাচার, বে-আইনি ও কোরআন নিষিদ্ধ কাজ হতে নিজেকে বিরত রাখতেন, এত গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও প্রজাদের প্রতি তিনি নিষ্ঠুর ছিলেন। প্রায়ই অন্যায়ভাবে সাজা দিতেন। প্রজার প্রাণনাশ করতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তাঁর ক্রোধ এতই প্রকট ছিল যে, রাগান্বিত হলে তিনি ভয়ঙ্কর অগ্নিমূর্তি ধারণ করতেন। প্রায়ই প্রতি সপ্তাহেই তাঁর রাজ্যে কোন না কোন কর্মকর্তা, কর্মচারি বা প্রজার প্রাণ কবজ করতেন।

বাংলার স্বাধীন সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে দু:শাসন, অবিচার ও নিপীড়নের অভিযোগ রয়েছে। তাঁর শাসনামলে প্রজার উপর অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে বলে বিভিন্ন উৎসে তাঁর বিবরণ দেখা যায়। ইলিয়াস শাহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দিল্লীর তৎকালীন সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে একটি ‘নিশান’ বা ঘোষণাপত্র জারি করেছিলেন। যাতে ইলিয়াসের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে তাঁর প্রজাসাধারণকে ইলিয়াসের কবল হতে রক্ষা করা যায়। ফিরোজ শাহের অন্যতম বিশিষ্ট কর্মচারী মালিক *অয়নুল-মুলক্ মাহরুর* চিঠিপত্রের সংকলনগ্রন্থ-

---

[৫৩] সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৭

[৫৪] ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩

ইনশা-ই-মাহরূ'র মধ্যে এই *নিশান* টি সংরক্ষিত হয়ে আছে।[৫৫] ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে নেশা সেবনের অভিযোগ রয়েছে। জিয়াউদ্দীন বারনি এবং অন্যান্য সমসাময়িক ও পরবর্তী ঐতিহাসিকেরা লিখেছেন যে ইলিয়াস শাহ ভাঙ বা সিদ্ধির নেশা করতেন।[৫৬]

বাংলার স্বাধীন সুলতান জালালউদ্দীন ফতে শাহের (১৪৮১-১৪৮৬ খ্রিঃ) আমলে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের দুর্ব্যবহারের কথাও বলা হয়ে থাকে। জালালউদ্দিন ফতে শাহের আমলে মুসলমান কাজীদের উৎকট ধর্মোন্মত্ততা ও হিন্দু-বিদ্বেষের নিদর্শন অন্য সূত্র থেকেও পাওয়া যায়।[৫৭] সুলতান সামশুদ্দিন আহম্মদ শাহ (১৪৩১-১৪৩৬ খ্রিঃ) একজন অত্যাচারী ও রক্তপিপাসু শাসক ছিলেন। তিনি প্রজাবর্গকে নিরর্থক হত্যা ও গর্ভবতী রমণীদের উদরবিদীর্ণ করতেন।[৫৮] যা নৃশংসতার সর্বোচ্চ পর্যায়। তাঁর অত্যাচার ও নির্যাতনে রাজ্যের জনগণ অতীষ্ট হয়ে উঠেছিল। বাংলার সুলতান শামসউদ্দিন মুজাফফর শাহের (১৪৯০-১৪৯৩ খ্রিঃ) বিরুদ্ধেও অত্যাচারের অভিযোগ পাওয়া যায়। তিনি রক্তপিপাসু শাসক ছিলেন। বে-আইনিভাবে বহু সংখ্যক ধার্মিক, বিদ্বান, সদ্বংশজাত মুসলমানদের তিনি হত্যা করেন। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পুত্র নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহের (১৫১৯-১৫৩১ খ্রিঃ) অত্যাচারের বর্ণনা পাওয়া যায়। নসরৎ শাহ সৈয়দবংশে জন্ম পরিগ্রহ করেও অসৎকার্য্যে ও পরপীড়নে লিপ্ত হতে শুরু করেন।[৫৯]

দিল্লী ও বাংলার বিচার ব্যবস্থায় মূখ্য ভূমিকা পালনকারী কাজীদের বিরুদ্ধেও স্বেচ্ছাচারিতা ও দূর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

আমির খসরু বিচারকার্য সম্পন্ন কারী কাজীদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এরা হল দূর্নীতিগ্রস্ত, অজ্ঞ এবং সাম্রাজ্যের দায়িত্ব পালন করতে অনুপযোগী।[৬০]

---

[৫৫] সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

[৫৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০

[৫৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১

[৫৮] শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪

[৫৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫

[৬০] সতীশ চন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫

এরা অহমিকা, ব্যর্থ ও সময় সম্পর্কে জ্ঞানহীন, নৈতিকতার প্রতি উদাসীন ও নিজেদের ক্ষমতার প্রতি অবিশ্বাসী।[৬১]

এ থেকে বুঝা যায়, বিচারকদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবজ্ঞা, অজ্ঞতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল। কাজীদের বিতর্কিত কাজের ফলে তাঁরাও সমালোচনার উর্ধ্বে ছিলেন না। দূর্নীতি ও অন্যায় কাজে সম্পৃক্ততার অভিযুক্ত কাজীদের অপসারণ, পদচ্যুতি ও পদাবনতি ইত্যাদি শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতো।

---

[৬১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহারঃ

ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের ইতিহাস বেশ দীর্ঘ ও চমকপ্রদ বটে। মুসলমানগণ এ অঞ্চলে কয়েকটি ধাপে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। সর্বশেষ অভিযান পরিচালিত হয় বাংলায়। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রথম অভিযান ছিল আত্মরক্ষামূলক। সিন্ধুর রাজা দাহির একটি আরব জাহাজ দেবল বন্দরে অন্যায়ভাবে আটক করেছিল। জাহাজটি দামেস্কের খলিফার জন্য সিংহল রাজার পাঠানো উপহার সামগ্রী নিয়ে সিংহল (শ্রিলঙ্কা) থেকে দামেস্কে যাচ্ছিল। জাহাজ আটকের খবর পেয়ে খলিফার পূর্বাঞ্চলের গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁর ভাতিজা তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ৭১১ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু অঞ্চলে অভিযান পাঠান। এটিই ছিল ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রথম সামরিক অভিযান।

ভারতবর্ষে দ্বিতীয় অভিযান পরিচালনা করেছিলেন গজনীর সুলতান মাহমুদ (৯৭১-১০৩০ খ্রিঃ)। তিনি মধ্য এশিয়ায় মুসলমানদের নতুন সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর অভিযানকে অনেকেই সম্পদ অর্জনের জন্য আক্রমণ বলে অভিহিত করলেও তারঁ সামরিক অভিযানের মাধ্যমে ভারতে মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতার ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল।

বাংলায় মুসলিম বাহিনীর সামরিক অভিযান পরিচালিত হয় অনেক পরে। দিল্লীর সুলতান মোহাম্মদ বিন সা'ম (মোহাম্মদ ঘুরী) এর সুযোগ্য সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবকের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় বখতিয়ার খলজির নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। বখতিয়ার ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে নদীয়ার রাজা লক্ষ্মণ সেনকে বিনা যুদ্ধে পরাজিত করে বাংলা জয় করেছিলেন। বখতিয়ার নব বিজিত মুসলিম রাজ্যে তাঁর শাসন ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বখতিয়ার তাঁর রাজ্যকে তিনটি শাসনতান্ত্রিক বিভাগে ভাগ করেছিলেন। বখতিয়ারের সেই বিভাগগুলোকে *ইকতা* এবং বিভাগীয় প্রতিনিধিকে *মুকতা* বলা হতো। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হিসেবে দিল্লীর অধীন শাসিত হয়েছিল। নানা অনিয়ম, অবিচার, দুর্নীতি, দুঃশাসন, সুলতানদের নিয়ন্ত্রণহীনতা, দিল্লীর সুদূরে বাংলার অবস্থান ও প্রাকৃতিক কারণে বাংলাকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করা দিল্লীর প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কাছে দূরূহ হয়ে পড়ে। এ সুযোগে একজন সাধারণ সেনা কর্মকর্তা

ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ দিল্লীর গভর্ণরকে হটিয়ে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাকে স্বাধীন করেন। তিনি বাংলা- বিশেষ করে সোনারগাঁও স্বাধীনভাবে শাসন করেছিলেন। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ তাঁর সময়ে সারা বাংলাকে একত্রীকরণ করেছিলেন এবং একক শাসন ক্ষমতার অধীনে নিয়ে আসেন। তাঁকে *শাহ-ই-বাঙ্গালা* নামে অভিহিত করা হয়। বাংলা দিল্লীর অধীন থেকে স্বাধীন হয়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রায় দু'শো বছর (১৩৩৮-১৫৩৮খ্রিঃ) স্বাধীনতা ভোগ করেছিল।

বাংলার স্বাধীন সুলতানগণের স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়ে ইতিহাস গবেষকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। মূলত বাংলা সম্পূর্ণ স্বাধীন হলেও বাংলার প্রশাসন, আইন, বিচার ও রাষ্ট্র পরিচালনার রীতিনীতি ও পদ্ধতি দিল্লীর প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার অনুকরণেই পরিচালিত হয়েছিল। সমসাময়িক শিলালিপি, মূদ্রা ও দলিলপত্র থেকে জানা যায়; বাংলার প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলো ছিল- ইকলিম, প্রদেশ, আরসাহ, শহর, থানা, কসবা, খিত্তা, মহল ও গ্রাম ইত্যাদি নামে বিভক্ত।

বাংলার সুলতানগণ ক্ষমতার প্রয়োগে সর্বক্ষেত্রে শরয়ী বিধান অনুসরণ করতেন। কুরআন, হাদিস ও শরয়ী আইনমতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। দেশীয় ও স্থানীয় প্রথা ও পদ্ধতির সংমিশ্রণও দেখা যায়। বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সর্বক্ষেত্রে সম্প্রদায়গুলো স্ব-স্ব ধর্মীয় রীতি-নীতি মেনে চলতেন। মুসলমান ও অ-মুসলমানরা তাঁদের ধর্ম ও আইন অনুসরন করে আচার অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন।

সুলতান সকল ক্ষমতার উৎস ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের সকল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কর্মচারি ও কাজি নিয়োগ দিতেন। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তিনি আইন ও বিধিমালা প্রনয়ণ করতেন। তিনি বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন। প্রধান বিচারপতি বা *কাজী-উল-কুজ্জাত* এবং অন্যান্য শাসনকেন্দ্রের বিচারক বা *কাজী* নিয়োগ, অপসারণ, বদলি ও পদোন্নতি ইত্যাদি সুলতানের এখতিয়ারাধীন ছিল।

বাংলায় সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজধানী সহ রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রশাসনিক কেন্দ্রে বিচারক বিদ্যমান ছিল। রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ শাখার মধ্যে অন্যতম হলো বিচার বিভাগ। রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘটিত অপরাধ নিরোধ করার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিচার প্রশাসন। জনগনের অধিকার নিশ্চিত করা, নাগরিক সুবিধা প্রাপ্তি, অন্যায় অবিচার ও নিপীড়নের শিকার

হতে মুক্তির নির্ভরযোগ্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হলো বিচার বিভাগ। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ একটি শক্তিশালী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজার আদালত, প্রধান বিচারপতির আদালত, প্রাদেশিক আদালত, পরগনার আদালত, জেলা আদালত ও গ্রামীণ আদালত প্রতিষ্ঠা করে বাংলার জনগণকে বিচারিক সেবা দিয়ে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন বাংলার সুলতানগণ। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯০-১৫১৯ খ্রিঃ) ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানী প্রকৃতির বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য *মুন্সেফ* আদালত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যার অস্তিত্ব আধুনিক বিচার প্রশাসনে লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে, দেওয়ানী কার্যবিধি আইন ১৯০৮ এর বিধানমতে গঠিত সহকারী জজকে *মুন্সেফ* আদালত হিসেবে অভিহিত করা হয়।

বাংলার সুলতানি আমলে গ্রাম ছিল প্রশাসনের সবচেয়ে ক্ষুদ্র ইউনিট। গ্রামগুলো পুরোপুরি স্বায়ত্বশাসিত ছিল। গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন। ক্ষুদ্র বিরোধের বিচার নিষ্পত্তি গ্রাম আদালতে করা হতো।

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত ছিল সুলতানের আদালত। এটি ছিল আদি ও আপিল আদালত। সুলতানের আদালত ছিল সর্বোচ্চ আপিল আদালত। অপরাধের সর্বোচ্চ সাজা এ আদালত অনুমোদন দিতেন। অপরাধের মার্জনাও করতেন রাজার আদালত।

বাংলার সুলতানি শাসনামলে অপরাধের সাজা ছিল কঠোর। মৃত্যুদণ্ড, বেত্রাঘাত, অঙ্গহানি, শূলে চড়ানো, লোহার শিকলে বেধে রাখা, জেলে আটক রাখা ও নির্বাসন ইত্যাদি সাজা অপরাধীদের ভোগ করতে হাতো।

বাংলার স্বাধীন সুলতানগণের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪১০ খ্রিঃ) তাঁর কৃত অপরাধের জন্য সোনাগাঁওয়ের কাজী সিরাজউদ্দিনের আদালতে সমন পেয়ে উপস্থিত হওয়ার ঘটনা বিরল উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। এছাড়াও রাজ্যে সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সুলতান আপোষহীন ছিলেন। অপরাধের শাস্তিদানে সুলতান কঠোর ছিলেন। সুলতান রুকনউদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রিঃ) বিখ্যাত দ্বীন প্রচারক ও মুজাহিদ শাহ ইসমাইল গাজীকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে শিরোচ্ছেদ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছিলেন। শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রিঃ) একজন প্রজাহিতৈষী, ধৈর্য্যশীল ও ধার্মিক সুলতান ছিলেন। তাঁর শাসনামলে কেউ প্রকাশ্যে মদ্যপান

করতে সাহস পেতো না। তিনি বিচারকদের পক্ষপাতিত্ব না করে সুবিচার করার জন্য নির্দেশ দিতেন। ঐতিহাসিকগণ বাংলার জনগণের সুখ-শান্তি, উন্নতি, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলকে স্বর্ণযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

সুলতানগণ সার্বভৌম ও স্বাধীন ছিলেন। তাঁরা নিজের নামে মুদ্রা জারি করতেন ও জুমার খুৎবা পাঠ করাতেন। বিভিন্ন বিশেষণে সমৃদ্ধ উপাধি ধারণ করে সুলতানগণ নিজেদের শোভা ও মর্যাদা বাড়াতেন।

সুতরাং উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, বাংলায় মুসলমান সমাজ ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছিল। প্রায় তিনশত বছরের অধিককাল কোনো বাধা বিঘ্ন ছাড়া তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পেরেছিল। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিরবিচ্ছন্নভাবে সুলতানগণ সফলভাবে বাংলা শাসন করেছিল। সাম্য সহিষ্ণুতা ও বিশ্বপ্রেমের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও বিপন্ন মানুষের ন্যায়বিচার নিশ্চিতে প্রশাসনিক কেন্দ্র ভিত্তিক কাজি নিয়োগ করে অপরাধের বিচার করেছিলেন। বাংলার সুলতানগণ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের আবেগ ও অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁরা উদারনীতির উপর ভিত্তি করে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। বৈষম্য ও শোষনহীন সমাজ বিনির্মাণে বাংলার বিচার বিভাগ দৃঢ় প্রতিশ্রুতিশীল ছিলেন।

বাংলার প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার কৃতিত্ব, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দোষগুণ নিরপেক্ষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, এটি ছিল প্রজাহিতৈষী ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা। দেশের সকল পর্যায়ে জনগণ ন্যায়বিচারের সুফল ভোগ করেছিল। দেশের আইন শৃঙ্খলা উন্নত হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ নিম্নস্তর থেকে শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত বিচার প্রার্থনা করতে পেরেছিলেন। বলা যায় বাংলার বিচার ব্যবস্থার মূলনীতি ছিল সততা, ন্যায়পরায়ণতা, জবাবদিহীতা ও নিরপেক্ষতা।

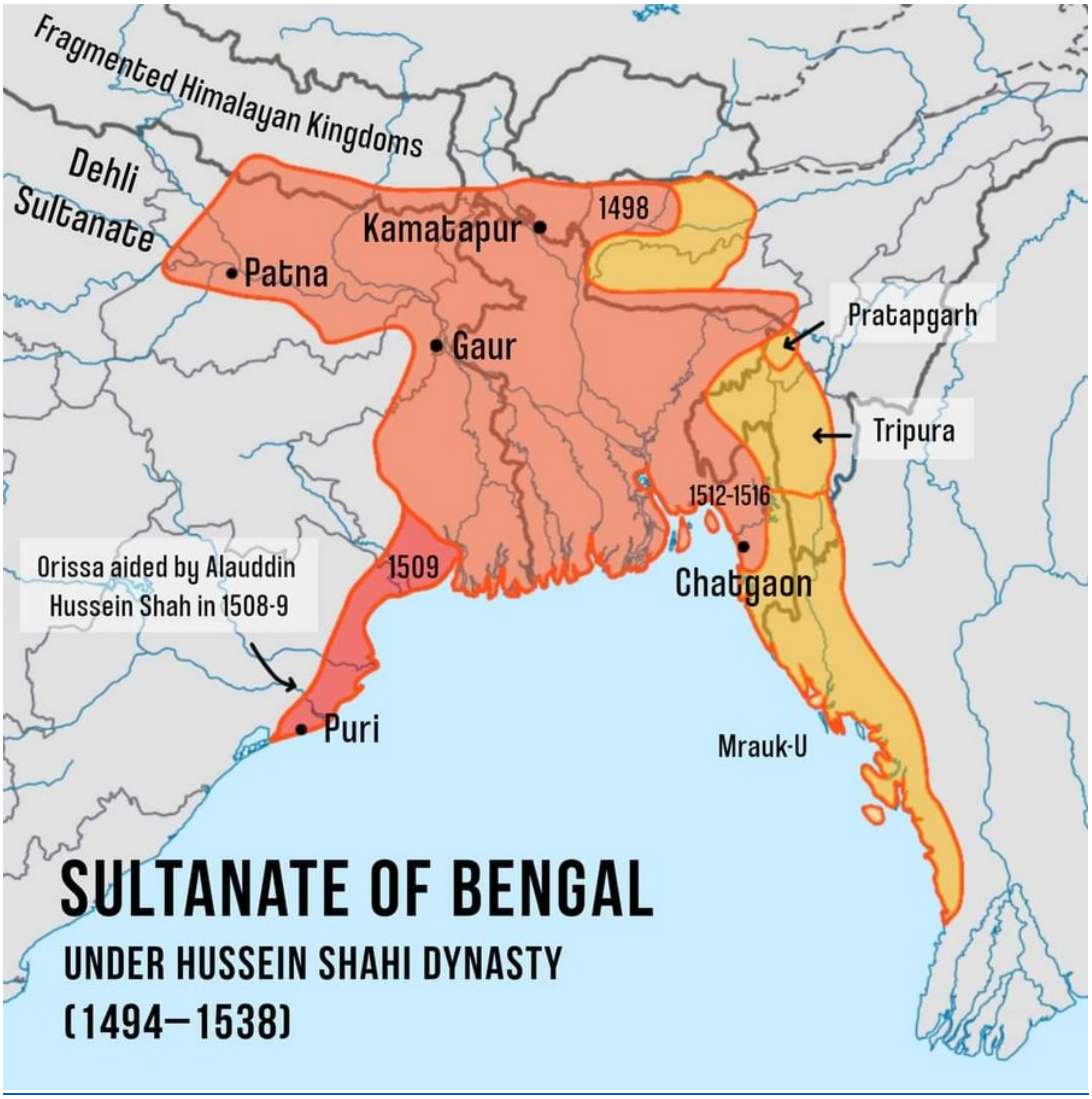
Fragmented Himalayan Kingdoms
Dehli Sultanate
Kamatapur
1498
Patna
Gaur
Pratapgarh
Tripura
1512-1516
Chatgaon
1509
Orissa aided by Alauddin Hussein Shah in 1508-9
Puri
Mrauk-U
SULTANATE OF BENGAL
UNDER HUSSEIN SHAHI DYNASTY
(1494–1538)

চিত্রঃ বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলের মানচিত্র।

Source:
https://x.com/TheBengalMuslim/status/1800384662394806461?lang=bn

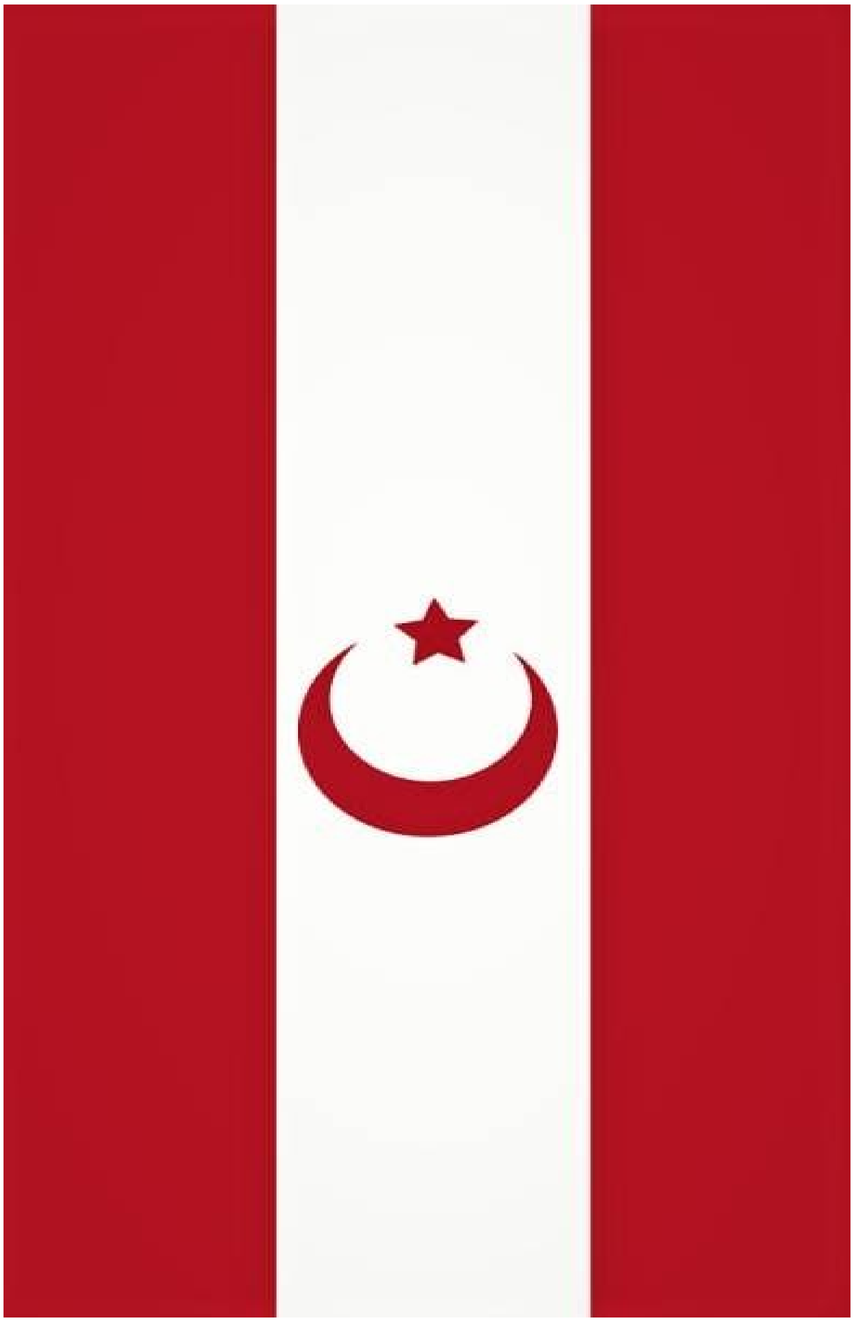

চিত্রঃ বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলের পতাকা।

Source:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Flag_%F0%9F%9A%A9_of_the_Bengal_Sultanate.jpg

বাংলার সুলতানদের বংশানুক্রমিক তালিকা

হিজরি	খ্রিস্টাব্দ	বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ
৭৩৯-৫০	১৩৩৮-৪৯	ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ (পূর্ববঙ্গ)
৭৫০-৫৩	১৩৪৯-৫২	ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ (পূর্ববঙ্গ)
৭৪০-৪৬	১৩৩৯-৪৫	আলাউদ্দীন আলী শাহ (লখ্নৌতি)

ইলিয়াস শাহী বংশ

হিজরি	খ্রিস্টাব্দ	বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ
৭৪০-৫৯	১৩৩৯-৫৮	শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (প্রথম ৬ বছর পশ্চিমবঙ্গে আলী শাহের প্রতিদ্বন্দ্বী)
৭৫৩-৫৯	১৩৫২-৫৮	ইখতিয়ারুদ্দীনের মৃত্যুর পর সমগ্র বঙ্গের শাসক
৭৫৯-৯২	১৩৫৮-৯০	সেকান্দার শাহ (১ম) (৭৫৮ হিজরীতে সোনারগাঁও থেকে মুদ্রা প্রচার)
৭৯২-৮১৩	১৩৯০-১৪১০	গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ
৮১৪-১৫	১৪১১-১২	সৈফুদ্দীন হামজা শাহ
৮১৫-১৭	১৪১২-১৪	শিহাবদ্দীন বায়েজিদ শাহ
৮১৭	১৪১৪	আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ

রাজা কংশের বংশ

হিজরি	খ্রিস্টাব্দ	রাজা কংশের বংশ
৮১৩-১৭	১৪১০-১৪	রাজা কংশ (সুলতানদের উপর বাস্তব শাসক)।
৮১৮-১৯	১৪১৫-১৬	জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ (রাজা কংশের পুত্র)।
৮২০-২১	১৪১৭-১৮	রাজা কংশ জালালুদ্দীনকে অপসারিত করে দনুজমর্দন দেব নাম গ্রহণ করে সিংহাসন দখল করেন। (১৩৩৯ ও ১৩৪০ শতাব্দে মুদ্রা প্রচার করেন)
৮২১-২২	১৪১৮-১৯	মহেন্দ্র দেব; সম্ভবত কংশের পুত্র।
৮২১-৩৫	১৪১৮-৩১	জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ (সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত)।
৮৩৫-৪৬	১৪৩১-৪২	শামসুদ্দীন আহমদ শাহ

ইলিয়াস শাহী বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

হিজরি	খ্রিস্টাব্দ	ইলিয়াস শাহী বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা
৮৪৬-৬৪	১৪৪২-৫৯	নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ
৮৬৪-৭৯	১৪৫৯-৭৪	রুকনুদ্দীন বারবক শাহ
৮৭৯-৮৬	১৪৭৪-৮১	শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ
অল্প দিনের জন্য		সেকান্দার শাহ
৮৮৬-৯১	১৪৮১-৮৬	জালালুদ্দীন ফতেহ শাহ

হাব্সী সুলতানগণ

হিজরি	খ্রিস্টাব্দ	হাব্সী সুলতানগণ
৮৯১	১৪৮৬	সুলতান শাহজাদা বারবক
৮৯১-৯৪	১৪৮৬-৮৯	সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ
৮৯৪-৯৫	১৪৮৯-৯০	নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ
৮৯৫-৯৮	১৪৯০-৯৩	শামসুদ্দীন মোজাফফর শাহ

হোসেন শাহের বংশ

হিজরি	খ্রিস্টাব্দ	হোসেন শাহের বংশ
৮৯৯-৯২৫	১৪৯৩-১৫১৯	আলাউদ্দীন হোসেন শাহ
৯২৫-৩৯	১৫১৯-৩২	নাসিরুদ্দীন নসরত শাহ
৯৩৯	১৫৩২	আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ
৯৩৯-৪৪	১৫৩২-৩৭	গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ

তথ্যসূত্রঃ

---

১. চৌধুরী শামসুর রহমান (অনুবাদ)ঃ এইচ. ই. স্টেপল্‌টন্ কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত খান সাহেব আবেদ আলী খান প্রণীত- *গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতি*, ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ১৮৩-১৮৫।

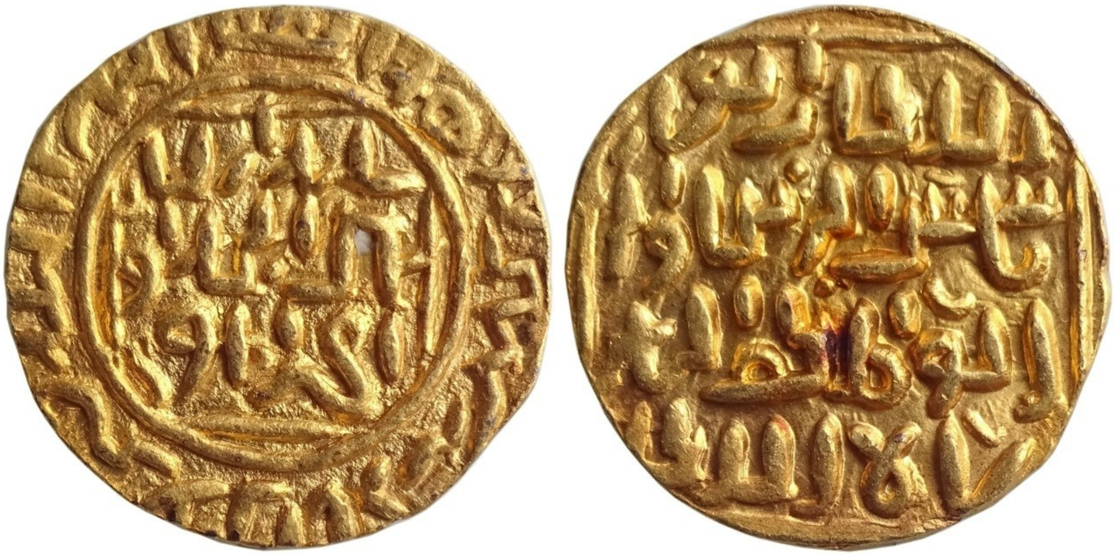

Weight : 10.92 Grams
G 350 Diameter : 24.69 mm

চিত্রঃ সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের স্বর্ণ মুদ্রা।

Picture of Bengal Sultanate Shams al Din Ilyas Shah AH 743-758, 1342-1357 AD Gold Tanka Balda Firuzabad Mint G&G B146 Very Rare G 350

Source: https://indiancoins.com/product/bengal-sultanate-shams-al-din-ilyas-shah-ah-743-758-1342-1357-ad-gold-tanka-balda-firuzabad-mint-gg-b146-very-rare-g-350/

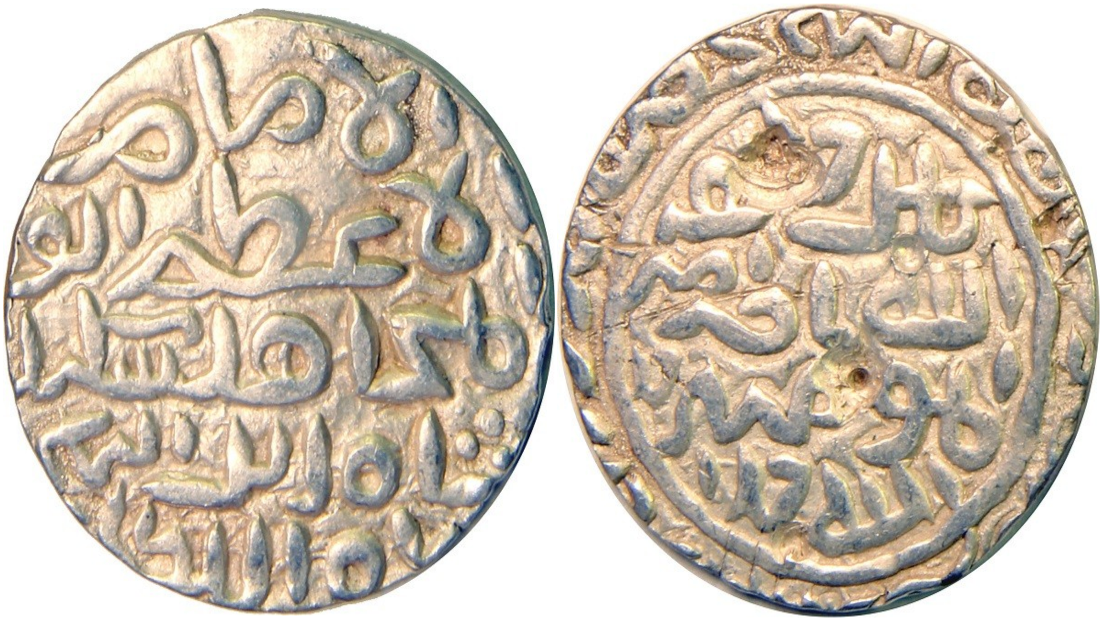

চিত্রঃ সুলতান সিকান্দর শাহের উপাধী সংশ্লিষ্ট মুদ্রা/টঙ্কা।

→ উপরোক্ত মুদ্রার পাঠোদ্ধারে দেখা যায় সুলতান সেকান্দর শাহ (১৩৫৭-১৩৮৯ খ্রিঃ) ***আল ইমামুল আজম*** বা মহান নেতা উপাধী ধারণ করেন; যা ন্যায়বিচারের সাক্ষ্য দেয়।

Source: https://en.numista.com/catalogue/pieces63323.html

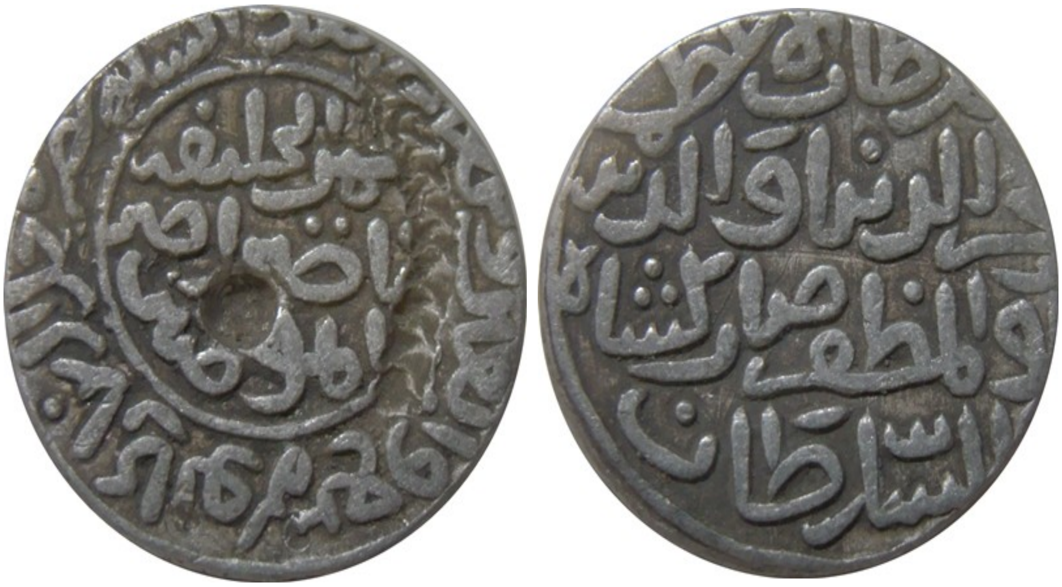

চিত্রঃ সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহের উপাধী সংশ্লিষ্ট মুদ্রা/টঙ্কা।

→ উপরোক্ত মুদ্রার পাঠোদ্ধারে দেখা যায় সুলতান সেকান্দর শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রিঃ) ***আল ইমামুল আজম*** বা মহান নেতা উপাধী ধারণ করেন; যা ন্যায়বিচারের সাক্ষ্য দেয়।

Al-sultan al-a zam fakhr al-dunya wa'a din abu'l muzaffar mubarakshah al-sultan

Source: **https://en.numista.com/catalogue/pieces79182.html**

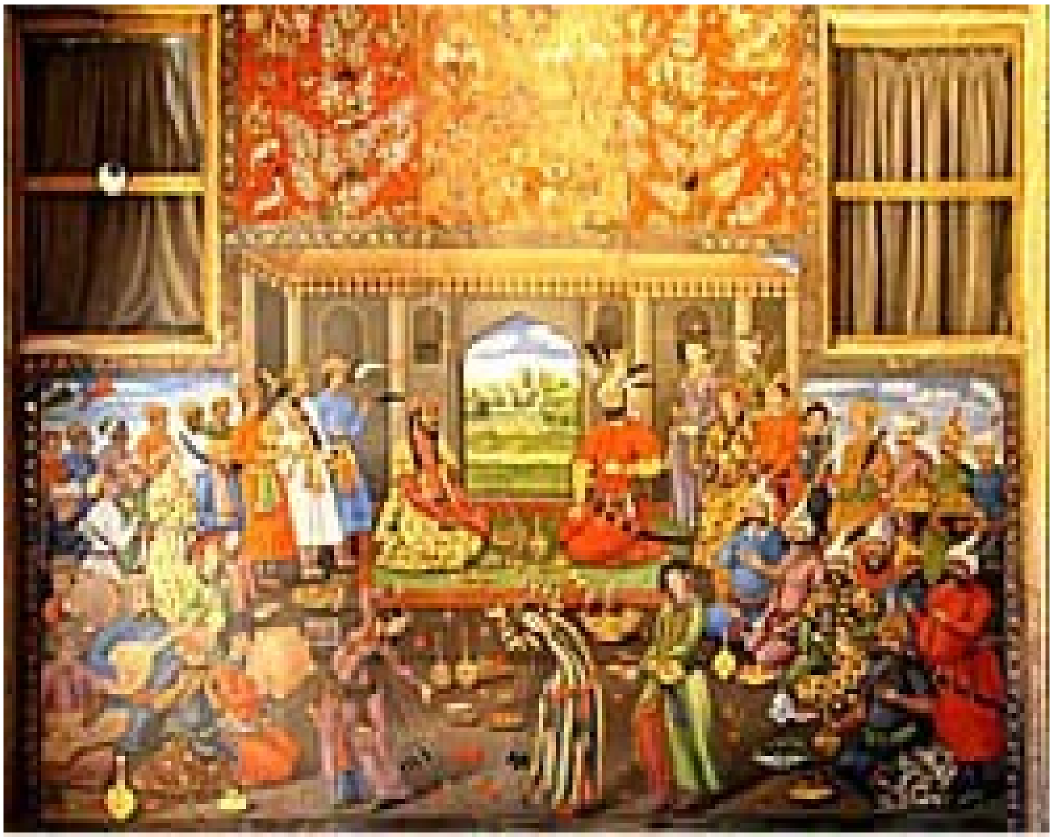

চিত্রঃ দিল্লী সুলতানী আমলের আদালতের প্রতিকী ছবি।

Source: https://www.indianetzone.com/society_delhi_sultanate

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থঃ

Nizami, Tajuddin Hasan : *Tajul Maasir* (in Urdu), New Delhi, National Council For Promotion of Urdu Language, Edition 2016

Al-Din, Aboo Omar Minhaj : *The Tabaqat- I- Nasiri,* Calcutta, College Press, 1864

Sirhindi, Yahiya Bin Ahmad Bin Abdullah : *The Tarikh-I-Mubarakshahi*, Calcutta, Baroda Oriental Institute, 1932

Afif, Ziaud-din-Barani Shams Siraj : *Tarikh-I-Firoz Shahi*, Calcutta, The Baptist Mission Press, 1891

Ross, Sir E. Denison (Edited) : *Tarikh-I-Fakhr-Ud-din Mubarak Shah*, London, 1927

Salim, Ghulam Hussain : *Riyazu-s-Salatin (A History of Bengal)* Trns. Maulavi Abdus Salam, Calcutta, The Baptist Mission Press, 1904

Stewart, Charles : *The History of Bengal,* London, WATTS Printer, Broxbourne, 1813

Husain, Mahdi (Trns) : *The Rehla of Ibn Battuta*, Calcutta, Baroda Oriental Institute, 1976

Dani, Ahmed Hasan : *Bibliography of Muslim Inscription of Bengal*, Dhaka, Asiatic Society of Pakistin, 1957

Dehlavi, Abdul Haque Muhaddis : *Akbar-Ul-Akhyar Fi Asrar-Ul-Abrar (Delhi),* AH-1332

Sarkar, Sir Jadunath *: The History of Bengle, Vol. 2*, 3rd Edition, University of Dhaka, 1976

Tusi, Abu Ali Hasan Ibn Ali : *Siyasatnama*, Quoted By Satish Chandra: *Medieval India From Sultanate to the Mughal, Vol. 1*, New Delhi, 1999

Blochman, H : *Contributions to the Geography and History of Bengal, JASB, Vol. 42*, Calcutta, 1873

Stapleton, H.E : *Catalogue of the Provincial Cabinet of Coins, Eastern Bengal and Assam*, Eastern Bengal and Assam Secretariat Press, 1911

Bhattasali, Nalini Kanta : *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal*, Dacca and Cambridge, 1922

Karim, Abdul : *Corpus of the Muslim Coins of Bengal (Down to A.D 1538)*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 2nd Edition, January 2013

Ali, Mohamad Mohar : *History of the Muslims of Bengal, Volume-IB, Survey of Administration, Society and Culture*, Dhaka, Islamic Foundation Bangladesh, November 2003 AD.

Hussain, Syed Ejaz : *The Bengal Sultanate: Politics, Economy and Coins, A.D. 1205-1576*, New Delhi Manohar Publishers and Distributors, 2003

ইংরেজী গ্রন্থপঞ্জিঃ

Chowdhury, Abdul Mumin (Editor) : *History of Bangladesh, Sultanate and Mughal Periods, (c.1200-1800 CE), Vol. 1, Political History*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, October 2020

Tarafdar, Momtazur Rahman : *Husain Shahi Bengal*, Dhaka, University of Dhaka, 1965

Qureshi, Ishtiaq Husain: *The Administration of the Sultanate of Delhi*, Delhi, Oriental Books Reprint Corporation, 1971

El-Awa, Mohamed Abdalla Selim : *The Theory of Punishment in Islamic Law, A Comparative Study*, United State, Pro Quest, March 1972

Akhtaruzzaman, Md : *Society and Urbanization in Medieval Bengal*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 2009

Ray, Aniruddha : *The Sultanate of Delhi (1206-1526) Polity, Economy, Society and Culture*, Delhi, Manohar Publishers & Distributors, 1st January 2019

Peters, Rudolph : *Crime And Punishment in Islamic Law*, New York, Cambridge University Press, 2005

Prasad, Ishwari : *History of Medieval India*, Allahabad, the Indian Press Ltd, 1933

Gandhi, B.M : V.D Kulshreshtha's *Landmarks in Indian Legal and Constitutional History*, Lucknow, Eastern Book Company, 2009

Mahajan, V.D : *Jurisprudence and Legal Theory*, Lucknow, Eastern Book Company, 2019

Khan, Md Ansar Ali : *Islamic Jurisprudence and Human Rights in Islam*, Dhaka, Hira publication, 2013

Majumdar, R.C (Others) : *An Advanced History of India*, India, Macmillan Limited, 1946

Habibullah, A.B.M : *The Foundation of Muslim Rule in India*, Allahabad, Central Publishing House.

Halim, Md Abdul : *The Legal System of Bangladesh*, Dhaka, CCB Foundation, 2012

Rahim, M.A: *History of the Afgans in India*, Karachi, Pakistan Publication House, 1961

Prasad, Ishwary : *Short History of Muslim Rule in India*, Allahabad, The Indian Press Limited, 1958

Husain, Wahed : *Administration of Justice During The Muslim Rule In India With A History Of The Origin Of The Islamic Legal Institutions*, Calcatta, University Of Calcatta, 1934

Khurana, K.L : *Medieval India (1000-1761 A.D.),* India, Lakshmi Narain Agarwal Educational Publishers, Edition-2017

Khan, Iqtidar Alam: *Historical Dictionary of Medieval India,* Meryland, USA, Scarecrow Press, April 25, 2008

Tripathi, R.P : *Some Aspects of Muslim Administration*, Allahabad, 1936

Jang, Alhajj Muhammad-Ullah Ibn Sarbuland : *A Dissertation on the Administration of Justice and Muslim Law*, Allahabad, 1926

Saran, Parmatma : *Provincial Government of the Mughals 1526-1658*, Allahabad, 1941

বাংলা গ্রন্থঃ

করিম, মোঃ রেজাউল (অনুবাদ) : নলিনীকান্ত ভট্টশালী বিরচিত- *বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম*, ঢাকা, জার্নিম্যান বুকস, অক্টোবর ২০১৯।

সরকার, হারুন অর রশিদ : *সুলতানি বাংলার মুদ্রা ও টাকশাল*, ঢাকা, অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৫।

রহমান, চৌধুরী শামসুর (অনুবাদ ও সম্পাদনা) : *গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতি*, ঢাকা, দিব্য প্রকাশন, ডিসেম্বর ২০১৯।

করিম, আবদুল : *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, মে ২০২১।

চৌধুরী, আবদুল মমিন (সম্পাদক) : *বাংলাদেশের ইতিহাস : সুলতানি ও মোগল যুগ (আনু: ১২০০-১৮০০ সা.অব্দ) ১ম খণ্ড*, *রাজনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০২০।

রহমান, আহমদ ফজলুর (অনুদিত) : আবুল ফজল আল্লামী বিরচিত- *আইন-ই-আকবরী*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুলাই ২০২২।

তরফদার, মমতাজুর রহমান : মোকাদ্দেসুর রহমান অনূদিত- *হোসেন শাহী আমলে বাংলা (১৪৯৪-১৫৩৮ খ্রিঃ)*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০১।

খান, ড. মুহাম্মদ আলী আসগর (অন্যান্য) : *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, রাজশাহী, বুকস্ প্যাভিলিয়ন, ২০০১।

মুখোপাধ্যায়, সুখময় : *বাংলার ইতিহাস (১২০৪-১৫৭৬ খ্রিঃ), সুলতানি আমল*, ঢাকা, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

শহীদুল্লাহ, মুহাম্মদ (অনুবাদ): **মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশতা** বিরচিত- *ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস*, ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২১।

আলীম, এ. কে. এম আবদুল : *ভারতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, এপ্রিল ২০১৪।

করিম, আবদুল : *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল*, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, মার্চ ২০১৮।

রহিম, ড. মুহম্মদ আবদুর (অন্যান্য) : *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, অক্টোবর ২০১৯।

আখতারুজ্জামান, ড. মো : *মুসলিম ইতিহাস* তত্ত্ব, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ডিসেম্বর ২০১৯।

নন্দ, বিশ্বেন্দু (ভাষান্তর) : **বিমল কুমার দত্ত** বিরচিত- *সুলতানি এবং মুঘলযুগে গ্রন্থাগার*, ঢাকা, গ্রন্থিক প্রকাশনী ২০২১।

তরফদার, মমতাজুর রহমান : *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী ১৯৯৩।

যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (অনুবাদ) : **সৈয়দ গোলাম হোসেন তবতবায়ি** বিরচিত *সিয়ার-উল-মুতাখখিরিন : বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ইতিহাস*, ঢাকা, দিব্য প্রকাশ ২০০৬।

সরকার, যদুনাথ : *বাংলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড*, দিল্লী, বি.আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, ২০০৩।

জিললি, ইশতিয়াক আহমেদ (অনুবাদ) : **শামস্ সিরাজ আফিফ** রচিত- *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী*, দিল্লী, প্রাইমাস বুকস, ২০১৫।

গুপ্ত, শ্রীরামপ্রাণ (সম্পাদিত) : **গোলাম হুসেন সলীম** বিরচিত- *রিয়াজ-উস-সালাতিন*, ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, অক্টোবর ২০১৯।

করিম, আবদুল : *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, মুসলমান আমল*, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২০।

মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুখময় : *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিঃ)*, ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, সেপ্টেম্ব ২০১৮।

মামুন, আবদুস সালাম : *উপমহাদেশের আইন ও শাসনের ইতিহাস*, ঢাকা, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, এপ্রিল ২০১৪।

হাসান, ড. সৈয়দ মাহমুদুল : *মুসলিম প্রশাসনব্যবস্থা*, ঢাকা, বাঁধন পাবলিকেশনস, ফেব্রুয়ারি ২০২৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস : *বাঙ্গালার ইতিহাস*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০১৯।

শাহরিয়ার, খন্দকার স্বনন : *মধ্যযুগের বাংলা, বখতিয়ার খলজি থেকে সিরাজ-উদ-দৌলা*, ঢাকা, বাতিঘর, ফেব্রুয়ারি ২০২৩।

আলী, ড. আহমদ : *ইসলামের শাস্তি আইন*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, নভেম্বর ২০১৯।

নদভি, মামুনুর রশিদ, (অনূদিত): **আল্লামা ইবন্ ফজলুল্লাহ উমর রহঃ** রচিত- *সালতানাতে হিন্দ*, ঢাকা, হেরার জ্যোতি প্রকাশন, এপ্রিল ২০২৩।

রহমান, মোঃ মুজিবুর : *ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন*, ঢাকা, বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানি, ২০২১।

রহমান, গাজী শামছুর (অন্যান্য) : *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, [১ম খন্ড, প্রথম ভাগ]*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫।

হালিম, মোঃ আবদুলন : *বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা*, ঢাকা, সি সি বি ফাউন্ডেশন, আগস্ট ২০০৯।

রহমান, ড. মোঃ শফিকুর : *বাংলাদেশের আইন বিচার ব্যবস্থ্যা এবং সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ*, ঢাকা, কামরুল বুক হাউস, জুন ২০১০।

রায়, অনিরুদ্ধ : *মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস, সুলতানী আমল, ত্রয়োদশ থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দি*, হায়দ্রাবাদ, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০০৫।

হক, ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল : *ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস (৭১২-১৯৭১ খ্রিঃ)*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, এপ্রিল ২০১৮।

রহমান, মাহবুবুর : *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, সুলতানি আমল (৭১২-১৫২৬খ্রি.)*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, জুলাই ২০১৯।

হক, কাজী এবাদুল : *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি ২০২১।

কানুনগো, সুনীতি ভূষণ : *বাংলার শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস*, ঢাকা, আফসার ব্রাদার্স, ২০২২।

চন্দ্র, সতীশ : *মধ্যযুগের ভারত (প্রথম খন্ড) সুলতানি আমল থেকে মুঘল আমল দিল্লি সুলতান (১২০৫-১৫২৬ খ্রিঃ)*, কলকাতা, বুকপোষ্ট পাবলিকেশন, জুলাই ২০১৭।

করিম, প্রফেসর মো. আব্দুল : *বাংলায় মুসলিম প্রশাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস [মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস] (১২০৫-১৭৫৭ খ্রিঃ)*, ঢাকা, রুদ্র প্রকাশ, মে ২০২২।

খান, আব্বাস আলী : *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আগস্ট ২০২১।

শাহনাওয়াজ, এ.কে.এম : *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগঃ সুলতানি পর্ব*, ঢাকা, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, জুন ২০১৪।

করিম, আবদুল : *বাংলার ইতিহাস, মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)*, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, আগস্ট ২০২২।

রহমান, লতিফুর (ভাষান্তর) : **এ.বি.এম হবিবুল্লাহ** বিরচিত *ভারতে মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ২০০৪।

উদ্দীন, আকবর (অনূদিত) : *বাংলার ইতিহাস*, ঢাকা, মতি আর্ট প্রেস, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১।

কোরায়শী, গোলাম সামদানী (অনূদিত) : **জিয়াউদ্দীন বারানী** বিরচিত *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন-১৯৮২।

শফীউল্লাহ, নুরনবী : *ভারতের মুসলমানদের ইতহাস*, ঢাকা, শিখা প্রকাশনী, ২০০৯।

আহমেদ, আশরাফউদ্দীন : *মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস (১২৫৮-১৮০০ খ্রিঃ)*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬।

হাসান, ড. সৈয়দ মাহমুদুল : *ভারত বর্ষের ইতিহাস*, ঢাকা ও বরিশাল, গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, এপ্রিল ১৯৮৫।

নুরনবী, প্রফেসর মোহাম্মদ : *মুসলমানের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (৫০০-১২৫৮ খ্রিঃ)*, ঢাকা, ঝিনুক প্রকাশনী, ২০০৯।

চৌধুরী, তেসলিম : *মধ্যযুগের ভারত, সুলতানি আমল*, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, মে-১৯৯৬।

সিনহা, গোপাল চন্দ : *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৩।

শ্রীমানী, সৌমিত্র : *ভারতের মধ্যযুগ*, কলকাতা, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ২০০৯।

চৌধুরী, হাসান আলী : *ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা, আইডিয়াল বুক্‌স, ১৯৯৩।

রসূল, ড. মোহাম্মদ গোলাম : *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

রহমান, শেখ হাফিজুর : *ভারতবর্ষ এবং বাঙালির সুশাসন (দ্বিতীয় খন্ড)*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, জানুয়ারি ২০১৮।

ভূঁইয়া, ড. মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ : *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, ঢাকা, গ্লোব প্রকাশনী, ১৬শ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৫।

ঘোষ, অধ্যাপক নির্মল কান্তি : *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা*, কলকাতা, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, মার্চ ২০০০।

আশরাফ, কে.এম : *হিন্দুস্তানের জন-জীবন ও জীবন চর্যা*, ঢাকা, সুচয়নী পাবলিশার্স, ২০১৯।

বাছির, ড. আবদুল : *মুসলিম রাষ্ট্রচিন্তার রূপরেখা*, ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, মে ২০১৮।

ছালাম, আবদুস : *বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ-মধ্যযুগ-আধুনিক যুগ)*, ঢাকা, রয়্যাল পাবলিকেশন্স, ২০১৯।

রহমান, সরদার আবদুর : *ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ*, ঢাকা, দিব্য প্রকাশনী, ২০১৯।

দাস, নিত্যরঞ্জন : *মুসলিম শাসন ও ভারতবর্ষ (৭১২-১৯৪৭ খ্রি.)*, ঢাকা, তুহিনা প্রকাশনী, ২০০১।

আহমদ, ওয়াকিল : *বাংলার মুসলমানের শিকড় ও আত্মপরিচয়*, ঢাকা, বইপত্র প্রকাশনী, ২০২১।

আবদুল্লাহ, আম্মার (অনূদিত) : ড. নুর আলম খলিল আল আমিনি বিরচিত- *হিন্দুস্তানে মুসলমান*, ঢাকা, পুনরায় প্রকাশন, ২০২২।

রহমান, মোঃ শহীদুর : *মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাস, ১ম খন্ড (১২০৫-১৭৫৭ খ্রিঃ)*, ঢাকা, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

চৌধুরী, কমল (সম্পাদক) : *বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রাচীন যুগ থেকে ইংরেজ আমল)*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০১১।

করিম, আবদুল : *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৪।

হাবিব, ইরফান : *মধ্যযুগের ভারতে প্রযুক্তি (৬৫০-১৭৫০ খ্রিঃ)*, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর ২০১৭।

মজুমদার, এ.কে.এম আবদুল আউয়াল, *বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা এবং নিম্ন আদালতের বিচার*, ঢাকা, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, অক্টোবর ২০২১।

জার্নালঃ

Journal of the Faculty of Law, The Dhaka University Studies Part-F

The Chittagong University Journal of Law, Chittagon+g University Press.

Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities), Dhaka.

Bangladesh Journal of law, Dhaka, Bangladesh Institute of Law and International Affairs (BILIA).

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ইসলামী আইন ও বিচার (ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা), ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর গবেষণা ত্রৈমাসিক, ঢাকা।

ইন্টারনেট উৎসঃ

→www.https://bn.m.wikipedia.org>wiki

→BOU e Book https://www.ebookbou.edu.bd

→**Error! Hyperlink reference not valid.**

→Wikipedia https://bn.m.wikipedia.org

→http://www.al-azhar.org/index.phd/alazhar/article/download/212/93

→https://jhs.bzu.edu.pk/upload/vo1%2011-19_8%20administration%20of%20justice%20in%20the%20sultanate%20of%20delhi.pdf51.pdf

→http://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/ijmer/pdf/volume10-issue8%286%29/5.pdf

→www.isdsnet.com/ijds

→https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Flag_%F0%9F%9A%A9_of_the_Bengal_Sultanate.jpg

→https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A4#/media/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0:Silver_Coin_of_Jalaluddin.jpg

→ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entry_gate_at_Gaur,_Malda..jpg

→ https://indiancoins.com/product/bengal-sultanate-shams-al-din-ilyas-shah-ah-743-758-1342-1357-ad-gold-tanka-balda-firuzabad-mint-gg-b146-very-rare-g-350/

→ https://x.com/TheBengalMuslim/status/1800384662394806461?lang=bn

→ https://www.indianetzone.com/society_delhi_sultanate

→ https://en.numista.com/catalogue/pieces63323.html

→ **https://en.numista.com/catalogue/pieces79182.html**